তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সপ্তম শ্রেণি

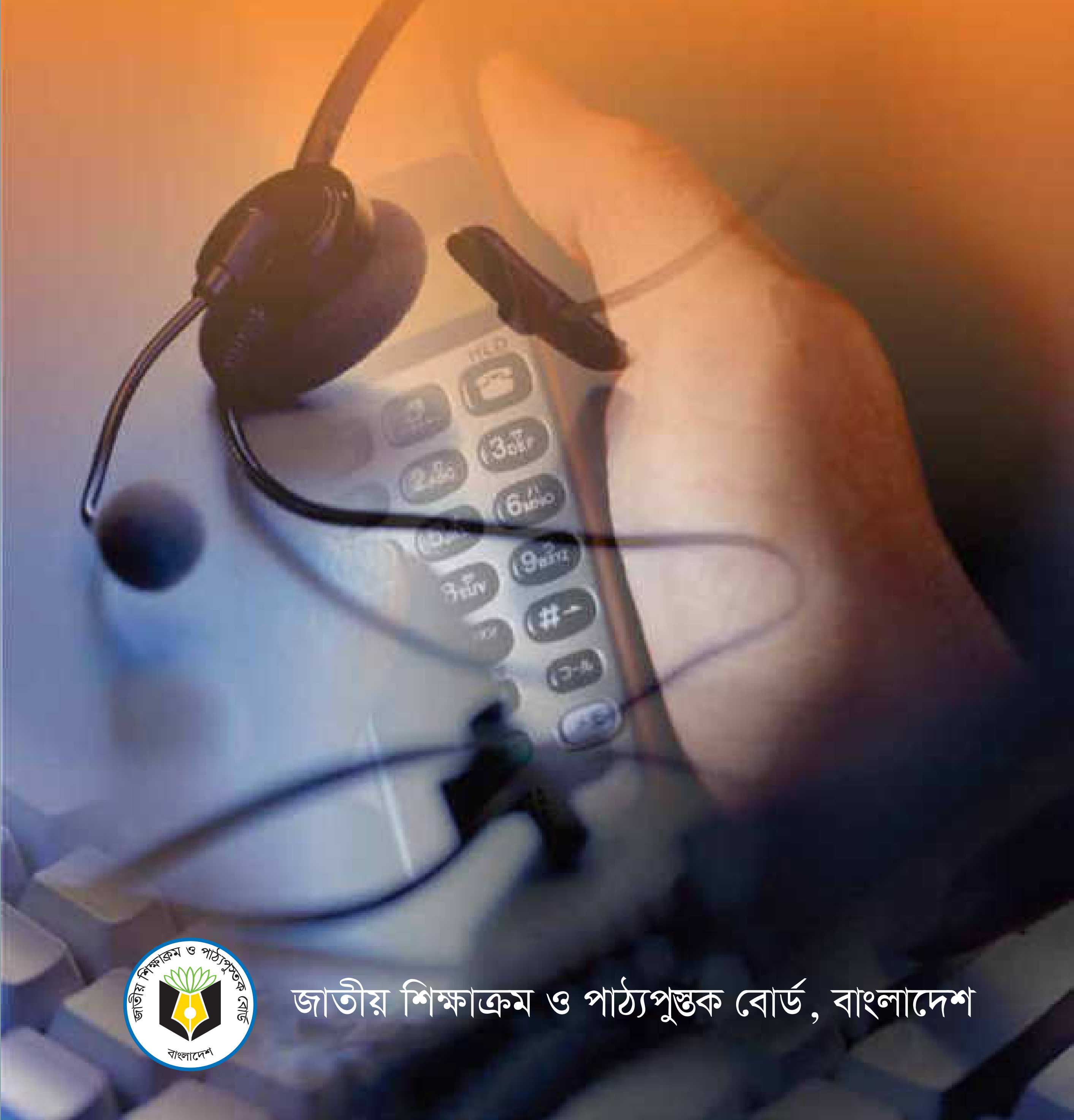

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ড. সুরাইয়া পারভীন

মোস্তাফা জব্বার

মুনির হাসান

লুৎফুর রহমান

মোঃ মুনাব্বির হোসেন

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষানীতিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থার সকল ধারায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয়েছে এ বিষয়ের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক। আশা করি, সপ্তম শ্রেণির **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি** পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সাক্ষরতা অর্জন, এই বিষয়ে আগ্রহী এবং নতুন কাজের সুযোগ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১-১৬
দ্বিতীয়	কম্পিউটার-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি	১৭-৩৬
তৃতীয়	নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার	৩৭-৫২
চতুর্থ	ওয়ার্ড প্রসেসিং	৫৩-৬০
পঞ্চম	শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার	৬১-৭২

প্রথম অধ্যায়

প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

১. ব্যক্তিজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব;

২. কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারব;

৩. কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;

৪. সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব-

পাঠ ১ : ব্যক্তিজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

পৃথিবীতে কত নতুন নতুন প্রযুক্তির জন্ম হচ্ছে, আমরা হয়তো তার সবগুলোর কথা জানতেও পারি না। তাই সেগুলো হয়তো আমাদের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এমন একটি প্রযুক্তি যেটি আমাদের সবার জীবনেই কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলেছে। পৃথিবীতে মনে হয় একজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে কোনো না কোনোভাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেনি কিংবা তার জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোনো না কোনো পরিবর্তন আনেনি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শুধু যে রাষ্ট্রীয় বড় বড় বিষয়ে কিংবা আন্তর্জাতিক জগতে ব্যবহৃত হয় তা নয়– একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনেও সেটি ব্যবহৃত হয়। তুমি যদি চোখ মেলে চারদিকে তাকাও তুমি দেখবে তোমার চারপাশে তোমার পরিচিত মানুষেরা, তোমার আত্মীয়স্বজন, তোমার স্কুলের শিক্ষকরা, তোমার ক্লাসের বন্ধুবান্ধবরা এবং তুমি কোনো না কোনোভাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছ। এই যে তুমি এই মুহূর্তে এই লেখাটি পড়ছ সেটি কেউ একজন লিখেছে–তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেগুলো ছাপা হয়েছে, তোমার সামনে আনা হয়েছে এবং তুমি এখন পড়তে পারছ। এরকম কত উদাহরণ দেয়া যাবে– তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

আমাদের চারপাশের যে কেউ এখন ইচ্ছে করলে অন্য একজনের সাথে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে

টেলিভিশন এখন বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম

একজন মানুষের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কী কী ব্যবহার হতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করলে সেটা মনে হয় কোনোদিন শেষ করা যাবে না। কিন্তু একটু চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? অন্তত পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা চেষ্টা করে দেখা যাক।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ: তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রথম উদাহরণ হতে পারে ব্যক্তিগত যোগাযোগ। আমাদের চারপাশের প্রায় সবার কাছেই এখন মোবাইল টেলিফোন রয়েছে, যে কেউ এখন ইচ্ছে করলে অন্য একজনের সাথে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে,

কোনো মানুষের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারার কারণে আমাদের জীবনের মান এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে, অনেক কম পরিশ্রমে আমরা এখন অনেক কিছু করতে পারি যেটা আগে কল্পনাও করতে পারতাম না।

বিনোদন: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে আমরা যে শুধু কাজ করতে পারি তা নয়– এটা এখন বিনোদনেরও চমৎকার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে গান শোনার জন্যে মানুষকে আলাদাভাবে কোনো একটা যন্ত্র কিনতে হতো– এখন মোবাইল টেলিফোনেই সে গান শুনতে পারে। একটা সময় ক্যামেরা ছিল শুধু ধনীদের ব্যবহারের বিষয়– এখন সাধারণ স্মার্ট ফোন দিয়েই যেকোনো মানুষ ছবি তুলতে পারে, ভিডিও করতে পারে। মোবাইল টেলিফোন ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান একটা যন্ত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা যায়– ঠিক সেরকম কম্পিউটারও ছোট হতে শুরু করেছে। ডেস্কটপ থেকে ল্যাপটপ, ল্যাপটপ থেকে নোটবুক, নোটবুক থেকে স্মার্ট ফোন অর্থাৎ আমাদের হাতে এমন একটা যন্ত্র চলে আসছে যেটা দিয়ে আমরা অসংখ্য কাজ করতে পারব।

জিপিএস পৃথিবীর যেকোনো জায়গার অবস্থান বের করে ফেলতে পারে

জিপিএস: গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাওয়ার প্রথম শর্তই হচ্ছে আমাদের পথঘাট চিনতে হবে। কেউ যদি পথঘাট চিনতে না পারে তাহলে সে কেমন করে গন্তব্যে পৌঁছবে। অথচ মজার ব্যাপার হলো কোথাও যেতে হলে এখন কাউকে পথঘাট চিনতে হয় না। পৃথিবীটাকে ঘিরে অনেক উপগ্রহ ঘুরছে তারা পৃথিবীতে সংকেত পাঠায়, সেই সংকেতকে বিশ্লেষণ করে যেকোনো মানুষ বুঝে ফেলতে পারে সে কোথায় আছে! তার সাথে একটা জায়গার ম্যাপকে জুড়ে দিতে পারলেই একজন মানুষ যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারবে। আজকাল নতুন সব গাড়িতেই জিপিএস লাগিয়ে দেয়া হয়। কোথায় যেতে হবে সেটি জিপিএস–এ ঢুকিয়ে দিলে জিপিএস গাড়ির ড্রাইভারকে সঠিক পথ বাতলে দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারবে। ১২ই মে ২০১৮ বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নামের এই মহাকাশ যানটি যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। নিজস্ব স্যাটেলাইটের অধিকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৫৭ তম দেশ।

দলগত কাজ

মনে করো তুমি ঠিক করেছ কোনো ধরনের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার না করে তোমার দিন কাটাবে। সারা দিনে কোন কাজগুলো তুমি করতে পারবে না তার একটা তালিকা করো

নতুন শিখলাম : ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, স্মার্ট ফোন, জিপিএস, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১।

পাঠ ২ : ব্যক্তিজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতি মুহূর্তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করি। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে অনেক সময় বিষয়টা আমরা লক্ষ পর্যন্ত করি না! এটির ব্যবহার কত ব্যাপক সেটা বোঝার জন্যে আমরা কাল্পনিক একজন মানুষের একটা দিনের কথা চিন্তা করি– ধরা যাক তার নাম সাগর।

কম্পিউটার ব্যবহার করে গান শোনা যায়

সাগরের ঘুম ভাঙল এলার্মের শব্দে, সে তার মোবাইল টেলিফোনে ভোর ছয়টার এলার্ম দিয়ে রেখেছিল। ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমেই তার মনে পড়ল আজ ছুটির দিন, তাকে কাজে যেতে হবে না! সাথে সাথে তার মনটা ভালো হয়ে গেল। এলার্মটা বন্ধ করার সময় লক্ষ করল সেখানে ডেস্ক ক্যালেন্ডার তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে আজ তার বন্ধুর জন্মদিন, বিকেলে তার বাসায় জন্মদিনের উৎসব।

ই- বুক রিডার ব্যবহার করে বই পড়া যায়

হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করতে করতে সে টেলিভিশনে ভোরের খবরটা শুনে নেয়। ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে শুনে তার মনটা ভালো হয়ে যায়। আবার বঙ্গোপসাগরে একটা নিম্নচাপ হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে সাগরের খানিকটা দুশ্চিন্তাও হলো।

নাশতা করে সাগর তার ল্যাপটপটি নিয়ে বসে, প্রথমেই সে তার ই-মেইলগুলো দেখে, তার প্রবাসী ভাই তার পরিবারের একটা ছবি পাঠিয়েছে। ছবিটা ভারি সুন্দর– সাগরের মনে হলো সেটা ঘরে টানিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। তাই সে প্রিন্টারে সেটা প্রিন্ট করে নিল।

ই-মেইলে চিঠিপত্রের উত্তর দিয়ে সে তার প্রিয় কয়েকটা গান বাজাতে শুরু করে দেয়। গান শুনতে শুনতে সে তার ই-বুক রিডারে একটা বই পড়তে শুরু করে। প্রিয় বই পড়তে পড়তে কীভাবে যে সময় কেটে গেল সাগর বুঝতেই পারল না!

যখন বইটা শেষ হয়েছে তখন একটু বেলা হয়ে গেছে। হঠাৎ করে তার মনে হলো বাসায় খাবার নেই। বাজার করা হয়নি। সাগরের হঠাৎ মনে হলো ইন্টারনেটে খাবারের অর্ডার দেয়া যায়– তারা বাসায় এসে খাবার পৌঁছে দেয়। সাগর তখনই ইন্টারনেটে তার প্রিয় খাবার বিরিয়ানির অর্ডার দিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসিখুশি এক তরুণ তার বাসায় বিরিয়ানি নিয়ে আসে। সাগর বলল, "আমার বাসাটা খুঁজে পেতে তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছে?" তরুণটি বলল, "একটুও অসুবিধে হয়নি– আমি জিপিএসে আপনার ঠিকানাটা দিয়ে দিয়েছি, সেটা আমাকে কোন পথে আসতে হবে বলে দিয়েছে।"

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ঘরে বসে সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করা যায়

সাগর খেতে খেতে আবার তার কম্পিউটারে পৃথিবীর খবরাখবর নেয়। নিউট্রিনো (Neutrino) নিয়ে বিজ্ঞানের একটা চমকপ্রদ খবর বের হয়েছে। নিউট্রিনো কী– সাগর সেটা জানে না তাই সে উইকিপিডিয়াতে নিউট্রিনো সম্পর্কে চমৎকার একটা লেখা পড়ে নিল। শুধু তাই নয়, নতুন একটা সিনেমা খুব নাম করেছে– সিনেমাটা দেখলে মন্দ হয় না। সাগর তখনই সিনেমাটা ডাউনলোড করতে শুরু করে দেয়, রাতে সে সেটা দেখবে।

বিকেলে বন্ধুর বাসায় জন্মদিনের উৎসবে যাবে– তাকে কিছু একটা উপহার দেয়া দরকার। বন্ধুটি বই পড়তে খুব ভালোবাসে তাই সাগর ইন্টারনেটে একটা বই অর্ডার দিয়ে দেয়, বন্ধুর বাসায় বইটা পৌঁছে যাবে। সে নিজের জন্যেও একটা বই অর্ডার দিল। ব্যাংকে যথেষ্ট টাকা আছে কি না জানা দরকার। সাগর তখন তার ব্যাংকে খোঁজ নিল, সেভিংস থেকে কিছু টাকা তার চেকিং একাউন্টে নিয়ে আসে।

দলগত কাজ
এখানে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর কী কী কাজ করা সম্ভব তার একটি তালিকা তৈরি করো।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তার মোবাইল বেজে উঠে– বাড়ি থেকে তার মা ফোন করেছেন। সাগর জিজ্ঞেস করল, "মা ভালো আছ তোমরা?" মা বললেন, "হ্যাঁ ভালোই আছি, তবে তোর বাবার চশমাটা মনে হয় বদলাতে হবে, স্পষ্ট নাকি দেখতে পায় না।" সাগর বলল, "তুমি চিন্তা করো না মা, আমি সামনের সপ্তাহে চলে আসব, বাবাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।"

মায়ের সাথে কথা শেষ করে সাগর মোবাইল টেলিফোনে তখনই ট্রেনের টিকেট বুক করে দেয়। ভালো চোখের ডাক্তারের খোঁজ নেবার জন্য সে রাতে ই–চিকিৎসা কেন্দ্রে খোঁজ নেবে।

বন্ধুর বাসায় জন্মদিনের উৎসবে সবাই মিলে খুব আনন্দ করল, ছোট বাচ্চারা ঘরের এক কোনায় হইচই করে কম্পিউটার গেম খেলছে। রাতে খাবার খেয়ে সাগর বাসায় ফিরে আসে। পরদিন কাজে যেতে হবে তাই সে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে শেষ খবরটা শুনে নেয়। উপগ্রহ থেকে ছবি তুলে দেখা গেছে ঘূর্ণিঝড়টা ঘুরে অন্যদিকে চলে গেছে। দেশের কোনো বিপদ নেই। খবরটা শুনে সাগরের মনটা ভালো হয়ে যায়– নিশ্চিন্ত মন নিয়ে সে ঘুমাতে গেল।

তোমরা কি লক্ষ করেছ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে সে সাগর সারাটা দিন কত কাজ করেছে? অল্প কিছুদিন আগেও কেউ কি এটা কল্পনা করতে পারতো?

নতুন শিখলাম : ই–বুক রিডার, উইকিপিডিয়া, ডাউনলোড, ই–চিকিৎসা কেন্দ্র, নিউট্রিনো।

পাঠ ৩: কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তোমরা সবাই জানো শিক্ষার্থীরা স্কুল শেষ করে কলেজে যায়, কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যায়। আমাদের দেশে অনেকগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। উচ্চমাধ্যমিক পড়া শেষ করে শিক্ষার্থীদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আলাদা করে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। এক সময় এই ভর্তি পরীক্ষার কাজটি ছিল খুব কঠিন, শিক্ষার্থীদের অনেক দূর থেকে দেশের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসে, ট্রেনে, জাহাজে যেতে হতো, লাইনে দাঁড়িয়ে ভর্তির ফর্ম আনতে হতো। সেই ফর্ম পূরণ করে আবার তাদের সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হতো, ক্যাশ টাকা জমা দিতে হতো, ফর্ম জমা দিয়ে পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিতে হতো, সেই প্রবেশপত্র নিয়ে পরীক্ষা দিতে হতো। পরীক্ষার খাতা দেখা শেষ হলে ফলাফল প্রকাশিত হতো– খবরের কাগজে সেই ফলাফল দেখে যারা সুযোগ পেত তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো।

স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে এখন প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা যায়

২০০৯ সালে শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করল তারা পুরো প্রক্রিয়াটি তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে শেষ করবে– এবং এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোথাও কোনো কাগজ ব্যবহার হবে না! ভর্তির রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনো প্রার্থীকে তার ঘর থেকে বের হতে হবে না। ২০০৯ থেকে দেশের প্রায় সব স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সময় এভাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এখন সবাই নিজের ঘরে বসে শুধু স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণে বিশাল একটি কর্মযজ্ঞ হয়ে গেল পানির মতো সহজ!

দলগত কাজ
তোমাদের স্কুলের অফিসকে কাগজবিহীন অফিসে রূপান্তর করতে হলে কী কী কাজ করতে হবে গুছিয়ে লেখো।

কাগজ ব্যবহার না করে অফিসের কাজকর্ম করার এই বিষয়টি আমাদের দেশে মাত্র শুরু হলেও ধারণাটি কিন্তু নতুন নয়। ১৯৭৫ সালে বিজনেস উইক নামের একটা ম্যাগাজিনে প্রথমবার এটি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল কিন্তু তখন সেটি ছিল অনেকটা কল্পবিজ্ঞানের মতো, কারণ এটি বাস্তবে রূপ দিতে হলে অফিসের সবার কাছে একটা কম্পিউটার থাকতে হবে– যেটি তখন কেউ চিন্তাও করতে পারত না।

বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদদের তৈরি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করে ভোট দেয়া ও ভোট গণনার কাজ করা যায়

এখন সেটি বাস্তবসম্মত হয়েছে। এখন অনেক অফিস পুরোপুরি কাগজবিহীন অফিসে পাল্টে গেছে। অফিসে কাগজে কিছু লিখতে হয় না– কম্পিউটারে লিখে একজন আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কম্পিউটারগুলো নেটওয়ার্ক দিয়ে একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হয়ে আছে কাজেই চোখের পলকে সব কাজকর্ম হয়ে যায়। কাগজে কিছু লেখা হয় না বলে কাগজের খরচ বেঁচে যায়। কাগজ তৈরি হয় গাছ থেকে তাই যখন কাগজ বেঁচে যায় তখন গাছও বেঁচে যায়, পরিবেশটা থাকে অনেক সুন্দর। কাগজে লেখার কালি বা টোনার ব্যবহার হয় না বলে রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পরিবেশও দূষণ হয় না।

যত দিন যাচ্ছে কম্পিউটারের মনিটরগুলো হচ্ছে বড়, তাই সেখানে কিছু একটা পড়ার কাজটিও হয়েছে অনেক সহজ। দেখা গেছে নতুন প্রজন্মের তরুণরা আজকাল কাগজে না লিখে কম্পিউটারে লিখতে পছন্দ করে, কাগজে না পড়ে মনিটরে পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এক সময় ক্যামেরায় ছবি তুলে সেগুলো প্রিন্ট করতে হতো। আজকাল ক্যা মরায় তোলা ছবি প্রিন্ট না করেই মানুষ সরাসরি কম্পিউটারে বা মোবাইলের স্ক্রিনে দেখে নেয়।

আমাদের দেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলোও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কাগজবিহীন অফিসে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং গ্রাহকদের সাথে ব্যাংকের যোগাযোগ থেকে শুরু করে গ্রাহকের সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা যাচ্ছে। ব্যাংকিং কার্যক্রমের এই পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি হল অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমের ব্যাপক ব্যবহার। এই সিস্টেমে গ্রাহকগণ তাদের অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে, তহবিল স্থানান্তর করতে এবং বাহ্যিক কাগজপত্রের প্রয়োজন ছাড়াই যে কোন বিল পরিশোধ করতে পারে। এই সিস্টেমে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ একটি গুরুত্বপুর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। অ্যাপের সাহায্যে গ্রাহকগণ তাদের স্মার্টফোন থেকেও সরাসরি লেনদেন করতে, ব্যালেন্স চেক করতে, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করতে এবং অন্যান্য সেবা গ্রহণ করতে পারে।

দলগত কাজ
তোমাদের ক্লাসে দুটি দল তৈরি করে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করলে কী সুবিধা এবং কী অসুবিধা সেটি নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

নতুন শিখলাম : টোনার, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন।

পাঠ ৪ : কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

কাগজ ব্যবহার না করে অফিসের কাজকর্ম চালানো যদি তথ্য প্রযুক্তির একটা ধাপ হয় তাহলে তার পরের ধাপটি কী হতে পারে?

তোমরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই অনুমান করে ফেলেছ– সেটি হবে অফিসে না গিয়েই অফিস করা। আমরা সবকিছুই যদি কম্পিউটার দিয়ে করি, আর সব কম্পিউটারই যদি নেটওয়ার্ক দিয়ে একটার সাথে আরেকটা জুড়ে দেয়া থাকে তাহলে আমি সেই কম্পিউটারটা অফিসে বসে ব্যবহার করছি নাকি বাসায় বসে ব্যবহার করছি তাতে কী আসে যায়? আসলেই কিছু আসে যায় না– আর সেটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের অফিসের ধারণা। ১৯৮৩ সালে প্রথম এটা নিয়ে আলোচনা হয় আর ১৯৯৪ সালে প্রথম এ ধরনের একটা অফিস শুরু হয়। যারা কাজ করছে তারা সশরীরে কেউ অফিসে নেই কিন্তু অফিসের কাজ চলছে– এরকম অফিসের নাম হচ্ছে ভার্চুয়াল অফিস।

একটি বিশাল কল সেন্টার

সব অফিসকেই যে ভার্চুয়াল অফিস বানানো যাবে তা নয়– কিন্তু যেগুলো বানানো যাবে– সেখানে অনেক লাভ। প্রথমত তোমাকে অফিসের জন্যে বড় বিল্ডিং করতে হবে না। রাস্তাঘাটের ট্রাফিক জ্যামের সাথে যুদ্ধ করে কাউকে অফিসে আসতে হবে না। বাসায় বসে কাজ করতে পারবে বলে অফিসের কাজের পাশাপাশি বাসার কাজকর্মও করতে পারবে। অফিসে গেলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করতে হবে– কিন্তু বাসায় বসে কাজ করলে অফিসের সময়ের বাইরেও অনেক কাজ করা সম্ভব! কাজেই ভার্চুয়াল অফিসের কাজকর্ম সাধারণ অফিস থেকেও বেশি হতে পারে।

ভার্চুয়াল অফিসের সবচেয়ে চমকপ্রদ সুবিধের কথাটা এখনো বলা হয়নি। সাধারণ অফিসে যারা কাজ করে তাদেরকে অফিসের কাছাকাছি থাকতে হয়। ভার্চুয়াল অফিসে যেহেতু কাউকে সশরীরে থাকতে হয় না তাই তারা যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারে। কাজেই এক অফিসের একেকজন হয়তো একেক শহরে থাকে। সত্যি কথা বলতে কী অনেক অফিসেই কিন্তু এভাবে কাজ করে। পৃথিবীটা যেহেতু তার অক্ষের উপর ঘুরে তাই এক পৃষ্ঠে যখন দিন তখন পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে রাত। দিনের বেলা হয়তো একদল অফিস করে ঘুমাতে গেল, তখন পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠের অন্য দল ঘুম থেকে উঠে কাজ শুরু করে দিলো। যার অর্থ অফিসটা চব্বিশ ঘণ্টা চলছে।

অনেক তরুণ তরুণী আজকাল অফিসে গিয়ে নয়টা পাঁচটা পর্যন্ত কাজ না করে নিজের ঘরে বসে স্বাধীনভাবে যখন ইচ্ছে কাজ করে

আজকাল কল সেন্টার বলে প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়– আমাদের দেশেও অনেক কল সেন্টার আছে। নানা ধরনের কল সেন্টার নানা ধরনের কাজ করে। কোন কোন কল সেন্টারের কর্মীরা নির্দিষ্ট কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ তেকে গ্রাহক বা সেবাগ্রহীতার নানা জিজ্ঞাসার জবাব দেয় এবং সেবা প্রদান করে। ধরা যাক কেউ একটা কম্পিউটার কিনেছে– সেই কম্পিউটারটা নিয়ে তার একটা সমস্যা হয়েছে তাই সে কম্পিউটারের কোম্পানীতে ফোন করল। সে হয়তো ভাবছে তার ফোনের উত্তর দিচ্ছে আশপাশের কোনো একজন মানুষ– আসলে সেই ফোনটি হয়তো চলে এসেছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে কোনো একটি কল সেন্টারে। সেখানে যারা আছে তারা এই প্রশ্নের উত্তরটা খুব ভালো করে জানে কারণ তাদের কাছে আগে হয়তো আরো অনেক মানুষ এই প্রশ্নটি করেছে। তাই খুব সহজেই কল সেন্টার থেকে উত্তর দিয়ে সেই মানুষটিকে খুশি করে দিলো।

দলগত কাজ
তোমাদের স্কুলে একটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম তৈরি করতে হলে কী কী করতে হবে সেটি লেখো।

আমাদের দেশের অনেক তরুণ–তরুণী আজকাল অফিসে গিয়ে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজ করার চেয়ে তার নিজের ঘরে বসে স্বাধীনভাবে যখন ইচ্ছে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাদের কাজের ক্ষেত্রটি তখন আর নিজের শহর কিংবা নিজের দেশের মাঝে আটকে থাকে না, তখন সেটা হয়ে যায় সারা পৃথিবী। তারা শুধু যে কাজ করে আনন্দ পায় তা নয়– অনেক টাকাও উপার্জন করতে পরে। এত কিছুর জন্য তার দরকার শুধু একটা কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের সংযোগ। অবশ্যই তার সাথে আরো একটা জিনিস দরকার– সেটা হচ্ছে দক্ষতা!

কাজেই তোমরা বুঝতেই পারছ নতুন পৃথিবীতে একসাথে মিলে অনেকে কাজ করতে হলে তাদেরকে আর এক জায়গায় বসে কাজ করতে হয় না। এই যে বইটা তুমি পড়ছ– তুমি কি জান যারা এই বইটা লিখেছে, সাজিয়েছে তারা কেউ কখনো একসাথে বসেনি– সবাই নিজের ঘরে বসে কাজ করেছে।

নতুন শিখলাম : ভার্চুয়াল অফিস, কল সেন্টার, কাগজবিহীন অফিস।

পাঠ ৫ : কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তোমরা নিশ্চয়ই জানো বাংলাদেশ এখন বিশাল বিশাল জাহাজ তৈরি করে পৃথিবীর বড় বড় দেশে রপ্তানি করে। আমাদের এত সুন্দর দেশটির ভেতর দিয়ে বিশাল বিশাল নদী গিয়েছে– এই দেশের মানুষ নদী-বিল-সমুদ্রে বড় হয়েছে– কাজেই তারা যে চমৎকার নৌকা আর জাহাজ বানাতে পারবে তাতে অবাক হবার কী আছে?

ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট দিয়ে আজকাল বিপজ্জনক যান্ত্রিক কাজ করা হয়

বড় বড় জাহাজ বানাতে হলে বিশাল বিশাল ধাতব টুকরোকে নির্দিষ্ট আকারে কেটে তারপর ওয়েল্ডিং করতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই পথে-ঘাটে দোকানে ওয়েল্ডিং করতে দেখেছ। সেখান থেকে যে তীব্র আলো বের হয় কেউ যদি সোজাসুজি সেদিকে তাকায় তাহলে তার চোখ পাকাপাকিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। যারা ওয়েল্ডিং করে তাদের বিশেষ চশমা পরে কাজ করতে হয়। সেখানে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়, ধাতব টুকরো ছিটকে ছিটকে পড়ে। কাজটি দেখেই মনে হয় এটি বেশ বিপজ্জনক কাজ। এই বিপজ্জনক কাজটি যদি মানুষকে করতে না হতো, কোনো একটা রোবট করত – তাহলে কেমন হতো?

তোমরা শুনে খুশি হবে– এ ধরনের বিপজ্জনক কাজগুলো আসলেই আস্তে আস্তে মানুষ নিজে না করে রোবটদের দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে। মানুষেরা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়– একঘেয়ে কাজ হলে কাজ করতে ইচ্ছেও করে না। রোবটরা ক্লান্ত হয় না। একঘেয়ে কাজটি নিয়ে তারা কখনো অভিযোগও করে না। তাই পৃথিবীর বড় বড় কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে আর মানুষ নেই। কাজ করে রোবটরা। মানুষেরা বড়জোর দেখে কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে কি না।

ড্রাইভার ছাড়াই এই গাড়ি চালানো যায়

একঘেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলো মানুষ থেকে রোবটেরা অনেক ভালোভাবে করতে পারে। কাজেই যত দিন যাচ্ছে ততই এই কাজগুলো মানুষের বদলে মেশিনেরা করছে– তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

আমাদের পথে-ঘাটে প্রতিদিন কত একসিডেন্ট হয়– মোটামুটি অনুমান করা যায় আর কয়েক দশক পর একসিডেন্ট কমে আসবে – কারণ তখন গাড়ি আর মানুষেরা চালাবে না। গাড়ি চালাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যন্ত্র। গাড়ির বেলায় সেটা শুরু হতে একটু দেরি হচ্ছে– আকাশ পথে সেটা কিন্তু এর মাঝে শুরু হয়ে গেছে। বিশাল বিশাল প্লেন যখন আকাশে উড়ে তখন পাইলটদের কিছু করতে হয় না– কম্পিউটারই সবকিছু করে। যুদ্ধবিমানে আজকাল পাইলট থাকেই না, পাইলটবিহীন ড্রোনগুলো যে প্রতিদিন ছবি তুলছে এবং ভিডিও করছে তা আমরা সবাই জানি।

একটি ক্যামেরা ড্রোন

আমাদের কাজের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি কেমন করে ব্যবহার হয় তার তালিকা করতে গেলে সেটি শেষ হবে বলে মনে হয় না। দাপ্তরিক চিঠিপত্র যোগাযোগের কথা তো আগেই বলা হয়েছে–অফিসের মিটিংগুলোও আজকাল অন্যভাবে হয়। বিভিন্ন অফিসের বিভিন্ন মানুষ আলাদাভাবে বসে একসাথে কনফারেন্স করে। আমাদের দেশেই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ই–ক্লাসরুম তৈরি হচ্ছে, একজন শিক্ষক তার ক্লাসরুমে পড়াবেন, সারা দেশের অসংখ্য মানুষ তার কাছে পড়বে। অফিস ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। আগে অফিসে বড় বড় ফাইল এক রুম থেকে অন্য রুমে যেতে দিন পার হয়ে যেত– নতুন ইলেকট্রনিক ফাইল চোখের পলকে এক অফিস থেকে অন্য অফিস চলে যায়। অফিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হয় টাকাপয়সা বা একাউন্টিং সংক্রান্ত, তথ্য প্রযুক্তির কারণে সেই কাজগুলো এখন সহজ হয়েছে – বড় বড় লেজার খাতায় মাথা গুঁজে কিছু লিখতে হয় না, কম্পিউটার মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু করে ফেলে।

দলগত কাজ
রোবট দিয়ে করাতে চাও এমন কতগুলো কাজের তালিকা তৈরি করো।

মানুষের কাজের জায়গায় সব সময়ই কাউকে না কাউকে কিছু একটা বলতে হয়, বোঝাতে হয়, আলোচনা করতে হয়। এসব কাজের জন্য এত চমৎকার ব্যবস্থা বের হয়েছে, এত সুন্দর করে সবকিছু করে ফেলা যায় যে মাঝে মাঝে মনে হয় আগে এই কাজগুলো কেমন করে করা হতো?

নতুন শিখলাম: রোবট, পাইলটবিহীন ড্রোন, ই–ক্লাসরুম

পাঠ ৬ : সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে আইসিটি: আমরা সবাই সমাজে থাকি। তুমি, তোমার বন্ধুরা হয়তো কোনো গ্রাম বা শহরে থাকো। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো স্কুলের হোস্টেলে থাকো। বাবা, মা, দাদা, দাদি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব – সবাইকে নিয়ে আমাদের সমাজ। এখানে কেউ চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ শিক্ষার্থী, কেউবা বাড়িতে গৃহস্থালীর কাজ করে। পারস্পরিক সম্পর্ক আর দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে একটি সমাজ এগিয়ে চলে। সমাজের নানা প্রয়োজনে আমরা নানান ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করি। এক সময় যোগাযোগ বলতে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হতো খবর দিতে। পরে দেখা গেল ঢোল বাজিয়েও খবর দেয়া যায়। মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন সে চিঠি লিখে মনের ভাব আর খবর পাঠাতে শুরু করল। গড়ে উঠল ডাক বিভাগ, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চিঠি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের আবিষ্কার এই ব্যাপারগুলোকে আরও সহজ করে ফেলালো।

ই-কার্ড অনেক চমকপ্রদ হতে পারে, কাগজ কালি ব্যবহার হয় না বলে অনেক পরিবেশবান্ধব।

আর এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সামাজিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারগুলোকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। আইসিটির প্রচলিত হাতিয়ারগুলোর পাশাপাশি এখন ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগের অনেক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে যা এই সামাজিক কর্মকাণ্ড সহজভাবে করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

আইসিটি ব্যবহার করে কীভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলো বিকশিত হচ্ছে তার কয়েকটি উদাহরণ আমরা প্রথমে দেখে নেই:

ক. অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রণ: এক সময় কেবল কাগজের আমন্ত্রণপত্র এবং টেলিফোনেই কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াত দেওয়া যেত। এখন এগুলোর পাশাপাশি ই-মেইল বা মুঠোফোনের খুদেবার্তায় (এসএমএস) দাওয়াত দেওয়া যায়। ই-মেইল বা খুদেবার্তার সুবিধা হলো তা যার কাছে পাঠানো হচ্ছে ঠিক সে সময়েই তাকে ফোন ব্যবহার করতে হয় না, তার সুবিধামতো সময়ে সে দেখে নিতে পারে।

খ. বিশেষ দিবসসমূহে শুভেচ্ছা বার্তা: তুমি তোমার বন্ধুদের জন্মদিন, ঈদ বা পূজার সময় শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠাতে চাও। যেসব বন্ধু তোমার আশপাশে থাকে তাদের কাছে তুমি তোমার হাতে বানানো কার্ড দিতে পারো। কিন্তু যারা ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন দূরত্বে থাকে? তাদের কাছেও কার্ড পাঠানো যায় ডাকযোগে তবে এখন সবাই পাঠায় ই-কার্ড। ই-কার্ড দুইভাবে পাঠানো যায়। একটি হলো তুমি নিজে কম্পিউটারে

ই-কার্ড তৈরি করে সেটি ই-মেইলে পাঠাতে পারো। আবার ইন্টারনেটে অনেক ই-কার্ডের সাইট আছে যেখান থেকে তোমার পছন্দের ই-কার্ডটি প্রিয়জনের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারো। এজন্য সাধারণত কোনো টাকাপয়সা খরচ হয় না। তোমার বন্ধু বা প্রিয়জন তাদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমার কার্ড পেয়ে যায়। আবার শুভেচ্ছা জানানোতে মুঠোফোনের খুদেবার্তা এখন অনেক জনপ্রিয়। এর মাধ্যমে খুব সহজে প্রিয়জনের কাছে শুভেচ্ছা, উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা পৌঁছে দেওয়া যায়। এখন বিভিন্ন এফএম রেডিওতে পছন্দের গান বাজিয়েও প্রিয় বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানানোর রেওয়াজ চালু হয়েছে। এসএমএস-এর মাধ্যমে শ্রবণ প্রতিবন্ধীরাও ভাববিনিময় করতে পারে। একইভাবে কথাবলা সফটওয়্যার -এর মাধ্যমে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরাও কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারে। এসবের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনগুলো দৃঢ় হয়।

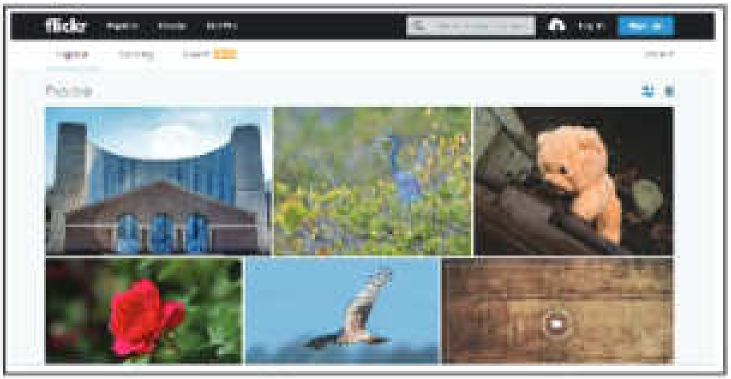

ছবি সংরক্ষণ আর বিতরণের জন্য চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে

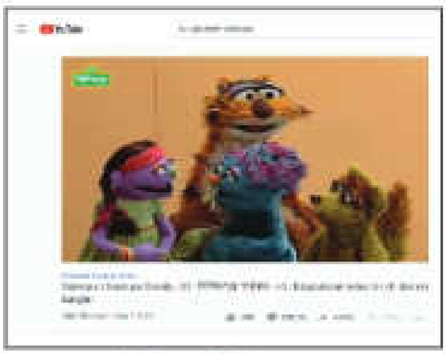

ইউটিউবে ভিডিও দেখা যায়

গ. স্মৃতি সংরক্ষণ ও বিনিময়: অনেকদিন আগে থেকে জীবনের রঙিন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির ছবি তুলে রাখা এবং তা সবার সঙ্গে বিনিময় (শেয়ার) করার একটি সংস্কৃতি রয়েছে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা তাদের অনুষ্ঠানটি ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করে রাখে। বর্তমানে এমন মোবাইল ফোন সহজলভ্য হয়েছে যেখানে ক্যামেরা এমনকি ভিডিও ক্যামেরাও রয়েছে। তার ফলে জীবনের যে কোনো মুহূর্ত আগামী দিনের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া এ ধরনের ডিজিটাল ছবি ইচ্ছে করলেই প্রিয়জনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। ইন্টারনেটে এখন বিভিন্ন সাইট রয়েছে যেখানে তুমি ছবি আপলোড করে তা অন্যদের জানাতে পারবে। এরকম সাইটগুলোর মধ্যে গুগল ফটোস (photos.google.com) এবং ইয়াহুর ফ্লিকার এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কেবল ছবি নয়, ইচ্ছে করলে তুমি তোমার তোলা ভিডিও সারাবিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারো ভিডিও শেয়ারিং সাইটের মাধ্যমে। এরকম সাইটগুলোর মধ্যে ইউটিউব (www.youtube.com) অধিক জনপ্রিয়।

দলগত কাজ

তোমাদের ক্লাসের কোনো একটি অনুষ্ঠানের জন্যে এসএমএস ব্যবহার করে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাও।

নতুন শিখলাম: খুদে বার্তা, ই-কার্ড, ভিডিও শেয়ারিং সাইট।

পাঠ ৭: সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সামাজিক যোগাযোগের সাইট: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের সামাজিক যোগাযোগকে দ্রুত, আকর্ষণীয়, এবং কার্যকরী করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, এর বাইরেও নানানভাবে আমাদের সামাজিক ব্যাপারগুলো ইন্টারনেটে উঠে এসেছে। আগের পাঠে বলা হয়েছে তোমার বন্ধুকে কোনো কিছু জানাতে হলে খুদেবার্তা বা ই-মেইল পাঠানোর কাজটি কিন্তু তোমাকে করতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তুমি যা কিছু করছো তাই তোমার বন্ধুরা জেনে যাচ্ছে, আলাদা করে তোমার কিছুই করতে হচ্ছে না তাহলে কেমন হয়? নিশ্চয়ই খুবই ভালো হয়। এই চিন্তা থেকে এখন ইন্টারনেটে গড়ে উঠেছে বেশকিছু সামাজিক যোগাযোগের সম্পূর্ণ সাইট। নিজের ভালোলাগা মন্দলাগা, অনুষ্ঠানাদি, চাকরিতে প্রমোশন, সন্তানাদির বিয়ে ইত্যাদি নানা বিষয়ের তথ্য, ছবি কিংবা ভিডিও বিনিময় করা যায় এগুলোর যে কোনো একটি থেকে। বর্তমানে প্রায় শতাধিক এরকম ওয়েবসাইট রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ফেসবুক (www.facebook.com), লিংকডইন (linkedin.com), এক্স (www. x.com), খুবই জনপ্রিয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাভাষী লোক এই সাইটগুলো ব্যবহার করে।

পৃথিবীর কোটিকোটি লোক ফেসবুক ব্যবহার করে

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ফেসবুক। পৃথিবীর কোটি কোটি লোক এখন ফেসবুক ব্যবহারকারী। বাংলাদেশেও ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে। ফেসবুক বা অনুরূপ সাইটগুলোতে প্রত্যেক ব্যবহারকারী তার পরিচিতিমূলক একটি বিশেষায়িত ওয়েবপেইজ চালু করতে পারেন। এটিকে বলা হয় ব্যবহারকারীর প্রোফাইল। ব্যবহারকারী তার নিজের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, তার ভালোলাগা, ভালো না লাগা ইত্যাদি বিষয়গুলো তার প্রোফাইলে প্রকাশ করে। এরপর একজন তার প্রোফাইল থেকে ফেসবুকে তার বন্ধু'দের খুঁজে বের করে। এখানে বন্ধু বলতে আমরা প্রচলিতভাবে যেটা বোঝাই সেটা বোঝানো হচ্ছে না, ফেসবুক অনুযায়ী একজন মানুষের সঙ্গে অন্য যত মানুষের যোগাযোগ থাকবে তারা সবাই হচ্ছে তার 'বন্ধু'। যদি তোমার বন্ধুটিরও ফেসবুকে প্রোফাইল থাকে তাহলে তুমি তাকে খুঁজে নিয়ে বন্ধু হওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারো। যদি সে সম্মতি দেয় তাহলে তোমরা বন্ধু হয়ে যাবে। একইভাবে অন্য কেউ যদি তোমাকে বন্ধু হওয়ার অনুরোধ করে আর তা তুমি গ্রহণ করো তাহলে তুমিও তার বন্ধু হবে। তুমি আর তোমার বন্ধুরা মিলে হবে তোমার 'নেটওয়ার্ক' বা তোমার 'সামাজিক নেটওয়ার্ক' বা সোশাল নেটওয়ার্ক (Social Network)।

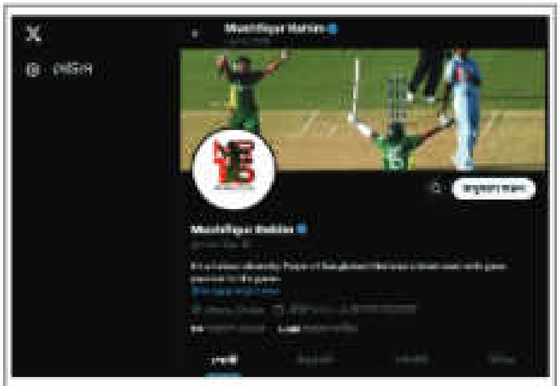

এক্স-এ ছোট ছোট পোস্ট দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া যায়

এখন তোমার নেটওয়ার্ক আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে। তোমার প্রাইমারি স্কুলের যে বন্ধুটির সাথে তোমার দীর্ঘদিন দেখা হয় না, যে কিনা এখন হয়তো অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, তাকেও তুমি এখানে খুঁজে পেতে পারো। তুমি যখনই তোমার প্রোফাইলে কোনো তথ্য প্রকাশ করবে সজো সজো তা তোমার বন্ধুদের পেজের একটি বিশেষ জায়গায় ভেসে উঠবে। তুমি তোমার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে যা ফেসবুকে 'স্ট্যাটাস' নামে পরিচিত। এক্স-এ এটাকে বলা হয় পোস্ট। তুমি যদি কোনো ছবি প্রকাশ করো, যদি কোনো ভিডিও সবাইকে দেখাতে চাও তাহলে তা তোমার প্রোফাইলে প্রকাশ করলেই তা তোমার নেটওয়ার্কের সবাই দেখতে পাবে। শুধু তাই নয়, তোমার বন্ধুদের সবাইকে ফেসবুক মনে করিয়ে দেবে তোমার জন্মদিন কবে! সবাই তখন তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারবে। কেবল তোমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নয়। এখন এই সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর মাধ্যমে পণ্যের বিজ্ঞাপন, কাজের খবর এমনকি সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজও হচ্ছে।

২০১০-২০১১ সালে তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়ার গণঅভ্যুত্থানে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ সাইটের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশে ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ও কোটা সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সোশাল মিডিয়া যেমনঃ ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

দলগত কাজ

ফেসবুকের মতো একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নতুন কী করা যায় সেটি লেখো।

নতুন শিখলাম: প্রোফাইল, সামাজিক নেটওয়ার্ক, স্ট্যাটাস।

নমুনা প্রশ্ন

১. কোন আবিষ্কারের ফলে নতুন কোথাও ভ্রমণের ক্ষেত্রে পথঘাট চিনতে সুবিধা হয়?

ক. কম্পিউটার খ. ইন্টারনেট

গ. মোবাইল ফোন ঘ. জিপিএস

২. নিউট্রিনো সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে আমরা কোনটি ব্যবহার করব?

ক. কম্পিউটার খ. ইন্টারনেট

গ. ল্যান্ডফোন ঘ. মোবাইল ফোন

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে–

i. বই পড়া যায়

ii. ব্যাংকের লেনদেন করা যায়

iii. গেম খেলা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রেবা এবার উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেখে এক রাতে বসেই সে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করে।

৪. রেবা ভর্তির আবেদন করতে পারে–

i. মোবাইল ফোন ব্যবহার করে

ii. ইন্টারনেট ব্যবহার করে

iii. কম্পিউটার ব্যবহার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. এ ধরনের আবেদন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সুবিধাদি হলো–

i. সময় ও অর্থ সাশ্রয়

ii. শারীরিক শ্রম লাঘব

iii. পরিবেশ সংরক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. রেবা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভর্তির আবেদন করেছিল তার নাম কী?

ক. মোবাইল প্রযুক্তি খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

গ. ইন্টারনেট ঘ. কম্পিউটার

৭. ৬ নম্বর প্রশ্নের যে উত্তরটি তুমি পছন্দ করেছ সে উত্তরটি পছন্দ করার কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

....

দ্বিতীয় অধ্যায়

কম্পিউটার-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

১. কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;

২. কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;

৩. কম্পিউটারের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ৮ : ইনপুট ডিভাইস

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা আইসিটি'র বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জেনেছ। এ পাঠে আইসিটি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তোমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

সময়ের সাথে এ যন্ত্রপাতিগুলো ক্রমেই আরও আধুনিক হয়ে উঠছে। বিষয়টা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, আজকের সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রটিই আগামীকাল পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া নতুন নতুন আবিষ্কার তো আছেই। টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটির কথাই ধরো এখন এমন টেলিভিশন পাওয়া যায় যেটা মুখের কথাতেই চলে। কথা বলেই এমন ইনপুট দেওয়া সম্ভব।
প্রযুক্তি খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তোমরা যারা এখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ছো তারা একটু উপরের শ্রেণিতে যেতে যেতেই এই যন্ত্রপাতির অনেকগুলোই জাদুঘরের সামগ্রীতে পরিণত হবে। তবুও বর্তমানে প্রচলিত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। কারণ যন্ত্রপাতি পাল্টে গেলেও ইনপুট, স্টোরেজ, প্রসেসিং এবং আউটপুটের ধারণাটা কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে না।

কীবোর্ড (Keyboard): কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়ার প্রধান (বহুল ব্যবহৃত) যন্ত্র হলো **কীবোর্ড** । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অধিকাংশ যন্ত্রে সাধারণত কীবোর্ডের মাধ্যমে ইনপুট দেওয়া হয়। এ সকল যন্ত্রকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে চাইলে যন্ত্রগুলোকে কিছু নির্দেশনা দিতে হয়। আমরা যখন কীবোর্ডের বোতাম চেপে যন্ত্রগুলোকে এ নির্দেশনাগুলো দেই। তখন যন্ত্রগুলো আমাদের চাওয়া অনুযায়ী কাজটি করে দেয়।

আজকের দিনের আধুনিক কম্পিউটার কীবোর্ডের ধারণা এসেছে টাইপরাইটার নামের এক ধরনের যন্ত্র থেকে। সাধারণত কীবোর্ডে বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ কিছু চিহ্ন সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকে। কম্পিউটারের কীবোর্ড টাইপ রাইটারের কীবোর্ডের মতো হলেও বিশেষ কাজের জন্য কিছু অতিরিক্ত কী থাকে।
কীবোর্ড সাধারণত ইংরেজি ভাষায় হলেও অন্যান্য ভাষার কীবোর্ডও পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সকল মোবাইল ফোনের কীবোর্ডে বাংলা লেআউট যুক্ত করার এক নির্দেশনা জারি করেছে।

কম্পিউটারের কীবোর্ড

মাউস (Mouse): তোমরা এর মধ্যে নিশ্চয়ই মাউস নামের একটি যন্ত্র ব্যবহার করেছ। এটি একটি জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস। একে অনেকে পয়েন্টিং ডিভাইসও বলে থাকে। যারা প্রথম এটি তৈরি করেছে তাদের ধারণা ছিল এটি দেখতে ইঁদুরের মতো, তাই এর নাম দেয়া হয়েছে মাউস।

মাউস

মাউসে সাধারণত দুটি বাটন ও একটি স্ক্রল চক্র (হুইল) থাকে। কম্পিউটারে ইনপুট দিতে এ বাটনগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে অনেক ধরনের মাউস প্রচলিত আছে। সাধারণ ব্যবহারকারীগণ স্ট্যান্ডার্ড মাউস ব্যবহার করে।

কম্পিউটারের মনিটরের পর্দায় মাউসের অবস্থান দেখানো হয় তীরের ফলার মতো একটি পয়েন্টারের মাধ্যমে। মাউসটি নড়াচড়া করা হলে পয়েন্টারটি অবস্থান পরিবর্তন করে। মাউসের বাটন ক্লিক করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়। চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে মাউসের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সাধারণত নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের চিহ্নের (আইকনের) উপর মাউসের বামদিকের বাটন একবার ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি নির্বাচিত (সিলেক্ট) হয় এবং পরপর দ্রুত দুবার ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি চালু হয়। ল্যাপটপ কম্পিউটারের টাচপ্যাড দিয়ে মাউসের কাজ সম্পাদন করা যায়।

মাইক্রোফোন

মাইক্রোফোন (Microphone):

এটিও একটি ইনপুট যন্ত্র। আমাদের কথা, গান বা যে কোনো ধরনের শব্দ এর মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রবেশ করানো যায়। বিশেষ করে ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগে কথা বলার ক্ষেত্রে এর জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। টেলিফোনে ব্যবহার করা হয় বলে এ যন্ত্রটির আবিষ্কার বেশ আগেই হয়েছে। তবে এখন এটাকে নিয়মিতভাবে কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কথা বলা ছাড়াও ভয়েস রিকগনিশনের ক্ষেত্রে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দলগত কাজ

১. এখানে উল্লেখ করা হয়নি এমন কতগুলো ডিভাইস যেগুলোর কীবোর্ড আছে সেগুলোর নাম লিখে উপস্থাপন করো।

২. প্রত্যেক দলের উপস্থাপনা থেকে একটি অভিন্ন তালিকা তৈরি করো।

নতুন শিখলাম: স্ক্রল চক্র (হুইল), আইকন, ভয়েস রিকগনিশন, মাইক্রোফোন।

পাঠ ৯ : ইনপুট ডিভাইস

ডিজিটাল ক্যামেরা

ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera): আমাদের খুবই পরিচিত একটি যন্ত্র হচ্ছে ক্যামেরা। এ সময়ে খুব জনপ্রিয় হলো ডিজিটাল ক্যামেরা। ডিজিটাল ক্যামেরার প্রচলন অনেক আগে থেকে শুরু হলেও কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে অনেক পরে। প্রথম দিকে গবেষণার কাজে বিশেষ করে মহাকাশ গবেষণায় ডিজিটাল ক্যামেরা কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে প্রায় সকল প্রকার ডিজিটাল ক্যামেরাই কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ডিজিটাল ক্যামেরাটিকে ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করে ডিজিটাল ছবি কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হয়।

ওয়েব ক্যাম বা ওয়েব ক্যামেরা

ওয়েব ক্যাম (Web Cam): ওয়েব ক্যাম বা ওয়েব ক্যামেরা ডিজিটাল ক্যামেরারই একটি বিশেষ রূপ। এটি হার্ডওয়্যার হিসেবে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে। সাধারণত ল্যাপটপ কম্পিউটারে ওয়েব ক্যামেরা সংযুক্ত থাকে। ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে স্থির চিত্র বা ভিডিও চিত্র কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে প্রবেশ করানো যায়। ওয়েব ক্যামেরা ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে সরাসরি ছবি বা ভিডিও আদান প্রদান করতে পারে। সামাজিক ওয়েব সাইটগুলোতে পারস্পরিক আলাপচারিতায় ওয়েব ক্যাম ব্যবহৃত হয়। ভিডিও কনফারেন্স বা ভিডিও ফোনে ওয়েব ক্যামের ব্যবহার সর্বাধিক। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে এ ক্যামেরার ব্যাপক ব্যবহারের কারণেই এর নাম হয়েছে ওয়েব ক্যাম।

ওয়েব ক্যাম বর্তমানে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাসা-বাড়িতে নিরাপত্তার প্রয়োজনে এ ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এ ক্যামেরার সাথে সরাসরি কম্পিউটারের সংযোগ থাকে। ফলে এ ক্যামেরা সার্বক্ষণিক ভিডিও চিত্র কম্পিউটারে প্রেরণ করে এবং তা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। পরবর্তীকালে সে ভিডিওচিত্র দেখে অপরাধী শনাক্ত করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশেও অপরাধ দমনে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

২০২৫

স্ক্যানার

স্ক্যানার (Scanner): এক সময় ফটোকপি মেশিনের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ডকুমেন্টের প্রতিলিপি (কপি) করতাম। কিন্তু এ প্রতিলিপি যতবার দরকার ততবারই মেশিন ব্যবহার করতে হতো। তথ্যটি সংরক্ষিত থাকত না। এ সমস্যাটির সমাধান যে যন্ত্রটি করে দিয়েছে তার নাম স্ক্যানার। যেকোনো প্রকার ছবি, মুদ্রিত বা হাতে লেখা কোনো ডকুমেন্ট অথবা কোনো বস্তুর ডিজিটাল প্রতিলিপি তৈরি করার যন্ত্রের নাম স্ক্যানার। এ ডিজিটাল প্রতিলিপি বিভিন্ন প্রকারের তথ্য ফাইল আকারে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায়।

ওএমআর বা অপটিক্যাল মার্ক রিডার

ওএমআর (OMR): ওএমআর-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক রিডার (Optical Mark Reader) এটিও একটি ইনপুট ডিভাইস। আলোর প্রতিফলন বিচার করে এটি বিভিন্ন ধরনের তথ্য বুঝতে পারে। ওএমআরের কাজের ধরন অনেকটা স্ক্যানারের মতো। বিশেষভাবে তৈরি করা কিছু দাগ বা চিহ্ন ওএমআর পড়তে পারে।

বর্তমানে এটি অনেকের কাছেই খুব পরিচিত। বিশেষ করে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তরপত্র যাচাইয়ে এটির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। সঠিক উত্তরের বৃত্তটির অবস্থান কম্পিউটারকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখা হয়। শিক্ষার্থীরা সঠিক বৃত্ত ভরাট করলে নম্বর পেয়ে যায়। অন্যথায় নম্বর পাওয়া যায় না। সঠিকটিসহ একের অধিক বৃত্ত ভরাট করলেও নম্বর পাওয়া যায় না। এর মাধ্যমে কম সময়ে অনেক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা যায়। এছাড়া মূল্যায়নে ভুল বা পক্ষপাতিত্ব হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

দলগত কাজ

১. এখানে উল্লেখ করা হয়নি এমন কতগুলো ডিভাইস যেগুলোর ক্যামেরা আছে সেগুলোর নাম লিখে উপস্থাপন করো।

নতুন শিখলাম: ডিজিটাল ক্যামেরা, ওয়েব ক্যাম, ভিডিও কনফারেন্স, স্ক্যানার, ডিজিটাল প্রতিলিপি, **OMR**।

পাঠ ১০: মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস

ষষ্ঠ শ্রেণিতে মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। এখন এগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানব। আজকাল কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ছাড়াও প্রায় সকল প্রকার প্রযুক্তি পণ্যেই মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সকল পণ্যই মাইক্রোপ্রসেসর দ্বারা পরিচালিত হয়। এ মাইক্রোপ্রসেসরকে চালনা করার জন্য কিছু নির্দেশনা দিতে হয়। এ নির্দেশনাগুলো জমা রাখার জন্য মেমোরি বা স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।

কম্পিউটার, স্মার্টফোন, গেম কনসোল বা এ ধরনের যাবতীয় যন্ত্রপাতির কাজ করার ক্ষেত্রে মেমোরি (Memory) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেমোরি দুই প্রকার। প্রধান বা প্রাথমিক মেমোরি এবং সহায়ক বা সেকেন্ডারি মেমোরি। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ যখন তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তখন প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বা সফটওয়্যার প্রধান মেমোরিতে অবস্থান করে। প্রধান মেমোরির গতি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এটি সিপিইউর সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত কাজ করতে সক্ষম হয়।

সাধারণত প্রধান বা প্রাথমিক মেমোরি দুই ধরনের–একটি হচ্ছে র‍্যাম RAM (Random Access Memory) এবং অন্যটি রম ROM (Read Only Memory)

৮ বিট = ১ বাইট
১০২৪ বাইট = ১ কিলোবাইট
(১০২৪×১০২৪) বাইট = ১ মেগাবাইট
(১০২৪×১০২৪×১০২৪) বাইট = ১ গিগাবাইট
(১০২৪×১০২৪×১০২৪×১০২৪) বাইট = ১ টেরাবাইট

প্রধান মেমোরির ক্ষমতা দুইভাবে প্রকাশ করা হয়। একটি হচ্ছে গতি যা হার্টজ (Hz) এবং অন্যটি হলো ধারণ ক্ষমতা যা বাইট (Byte) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এক বাইট সমান ৮ বিট, ১০২৪ বাইট যেহেতু ১০০০–এর খুব কাছাকাছি সেজন্য একে এক কিলোবাইট বলা হয়।

র‍্যাম (RAM): আইসিটি পণ্য তথা কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের মাদারবোর্ডের সাথে র‍্যাম সংযুক্ত থাকে। প্রসেসর প্রাথমিকভাবে র‍্যামে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা করে। প্রসেসর র‍্যাম থেকে তথ্য নিয়ে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে। প্রসেসর র‍্যামের যে কোনো জায়গা থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে বলে একে Random Access Memory বা সংক্ষেপে RAM বলা হয়। এখনকার দিনে প্রসেসরের ক্ষমতা যেমন বেড়েছে তেমনি সফটওয়্যারগুলো অনেক কার্যকর এবং জটিল হয়েছে তাই এগুলোকে মেমোরির অনেক বড় অংশ ব্যবহার করতে হয়। সেজন্য এখনকার

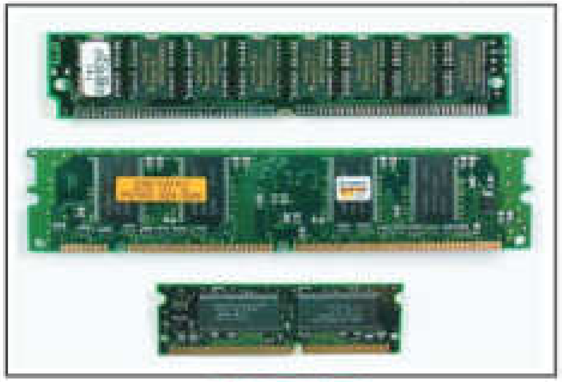

নানা ধরনের র‍্যাম

কম্পিউটারগুলোর জন্য কমপক্ষে ৮ গিগাবাইট বা তার চেয়ে বেশি মেমোরি দরকার হয়। প্রসেসরের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে র‍্যামের গতিও এখন অনেক।

এখানে একটি বিষয় তোমাদের জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন– র‍্যামে তথ্য থাকা না থাকা বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিলে এর সমস্ত তথ্য মুছে যায়। অর্থাৎ কম্পিউটার চালু করলেই র‍্যাম প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে থাকে। আবার কম্পিউটার বন্ধ করলে র‍্যাম তথ্য–শূন্য হয়ে যায়।

রম (ROM): ROM বা Read Only Memory মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। আইসিটি যন্ত্রপাতি বা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সচল রাখার জন্য কিছু নির্দেশনা প্রয়োজন হয়। এ নির্দেশনাগুলো ছাড়া কম্পিউটার চালু করা যায় না। তাই রম এ নির্দেশনাগুলো স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে। বিদ্যুৎ থাকা না

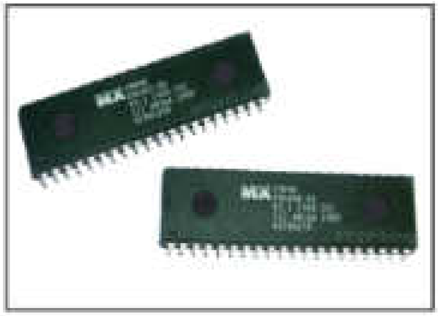

রম (Rom)

থাকার উপর এই মেমোরি নির্ভর করে না। ব্যবহারকারীও বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এটি মুছে ফেলতে পারে না। এ মেমোরি শুধু পাঠ করা যায় বলে একে ROM বা Read Only Memory বলে। যেহেতু বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এর তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন করা যায় না তাই একে স্থায়ী মেমোরি বলে।

দলগত কাজ

র‍্যাম ও রম নামে দুটো দল গঠন করে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে বিতর্ক কর।

নতুন শিখলাম: মাইক্রোপ্রসেসর, বিট, বাইট।

পাঠ ১১: স্টোরেজ ডিভাইস

হার্ডডিস্ক

হার্ডডিস্ক (Hard Disk): তোমরা যারা কম্পিউটার ব্যবহার করেছ তারা নিশ্চয়ই হার্ডডিস্কের কথাও জেনে গেছ। কম্পিউটারে খোলা ফাইল হার্ডডিস্কে জমা করে রাখা হয়। এটি আসলে তথ্য সংরক্ষণের প্রধান যন্ত্র। IBM কোম্পানী ১৯৫৬ সালে মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণের জন্য প্রথম হার্ডডিস্কের ব্যবহার করে। আইসিটি যন্ত্রগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এদের তথ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা। আজকের কম্পিউটারগুলোতে সাধারণত ৫০০ গিগাবাইট থেকে ৪ টেরাবাইট তথ্য ধারণক্ষমতার হার্ডডিস্ক লাগানো থাকে। এমনকি সাধারণ মোবাইল ফোনের তথ্য ধারণ ক্ষমতাও গিগাবাইটে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা শুনলে অবাক হবে ১৯৮০ সালে ১ গিগাবাইট তথ্য ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হার্ডডিস্কের আকার ছিল একটি বড়সর রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজের সমান। আর এর দামও ছিল অনেক! প্রতি মেগাবাইটের জন্য পনেরো হাজার ডলার বা বারো লাখ টাকা খরচ করতে হতো। মনে হচ্ছে গালগল্প। কিন্তু এটাই বাস্তব! এখনকার হার্ডডিস্কগুলো প্রায় হাতের মুঠোয় এঁটে যায়।

সাধারণত হার্ডডিস্কে কতগুলো চাকতি থাকে যাদের প্লটার বলা হয়। প্লটারগুলো অ্যালুমিনিয়াম এলয় বা কাচ বা সিরামিকের চাকতির উপর পাতলা চুম্বকীয় পদার্থের আস্তরণ দিয়ে তৈরি হয়। এই চুম্বকীয় পদার্থের উপরই তথ্য সংরক্ষিত থাকে। হার্ডডিস্ক চালু হলে এই প্লটারগুলো ঘুরতে থাকে। ঘূর্ণায়মান চাকতিগুলোর সংস্পর্শে হার্ডডিস্কের লেখা/পড়া (Write/Read) হেডটি এলে সে প্লটারে তথ্য সংরক্ষণ অথবা তথ্য পড়ে আমাদের প্রদর্শন করে।

তথ্য ধারণক্ষমতার কারণে হার্ডডিস্ক অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি কম্পিউটারের সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। অন্যটি আলাদাভাবে থাকে। একে এক্সটারন্যাল হার্ডডিস্ক বলে। এটি USB পোর্টের মাধ্যমে যেকোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সাথে সংযোগ দিয়ে কাজ করা যায়। ফলে বিপুল পরিমাণ তথ্য এক স্থান থেকে অন্যত্র নিতে এখন আর সম্পূর্ণ কম্পিউটারটি না নিয়ে শুধু এক্সটারনেল হার্ডডিস্কটি নিয়ে গেলেই হয়।

সলিড স্টেট ড্রাইভ (SSD): তোমাদের মধ্যে যারা অতি সম্প্রতি কম্পিউটার কিনেছ অথবা সাম্প্রতিককালের কোন কম্পিউটার ব্যবহার করেছ তারা সলিড স্টেট ড্রাইভ বা এসএসডি সম্পর্কে জেনে থাকবে। এসএসডি হল এক ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস যা কম্পিউটার এবং ল্যাপটপে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রচলিত হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ (HDD) থেকে ভিন্ন, এটিতে কোনো চলমান অংশ থাকে না, ফলে এটি আরো দ্রুত এবং আরও অধিক টেকসই হয়। এটি ডেটা সংরক্ষণ করতে ফ্লাশ মেমরি ব্যবহার করে, যা ফাইল এবং অ্যাপ্লিকেশনে দ্রুত অ্যাক্সেসের সুযোগ দেয়। উল্লেখ্য ফ্লাশ মেমরি হল একটি ইলেকট্রনিক নন-ভোলাটাইল স্টোরেজ যাতে ডেটা বৈদ্যুতিকভাবে মুছে ফেলা এবং পুনরায় প্রোগ্রাম করা বা ডেটা সংরক্ষণ করা যায়।

কম্পিউটার চালু করার সময় কমিয়ে এবং সফটওয়্যার লোড করার গতি বাড়িয়ে সিস্টেমের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সাধারণত এসএসডি ব্যবহার করা হয়। এসএসডিতে কোন স্পিনিং ডিস্ক নেই, তাই এটি কোন শব্দ উৎপন্ন করে না এবং হার্ডডিস্ক এর চেয়ে কম তাপ উৎপন্ন করে। এটি বাহ্যিক ক্ষতি যেমন শক এবং ড্রপ হিসাবে আরো বেশি প্রতিরোধী। এসএসডি বিভিন্ন আকারে বাজারে পাওয়া যায়, সাধারণত ১২৮ গিগাবাইট (GB) থেকে বেশ কয়েক টেরাবাইট (TB) পর্যন্ত। সামগ্রিকভাবে, এসএসডিকে গতি, নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতার জন্য পছন্দ করা হয়।

এসএসডি

ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ও মেমোরি কার্ড (Flash Drive & Memory Card): যারা কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের কম্পিউটারের অনেক তথ্য এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে নিতে হয়। সেটা সবচেয়ে সহজে করা যায় নেটওয়ার্কিং ব্যবহার করে। যেখানে নেটওয়ার্ক নেই সেখানে তথ্য নিতে হলে কোনো এক ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার করতে হয়। যে স্টোরেজ ডিভাইসটি সবচেয়ে সহজে বহন করা যায় সেটার নাম পেনড্রাইভ কিংবা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ। নাম শুনেই বুঝতে পারছো এটা পেন বা কলমের মতো ছোটো এবং পকেটে করে নেয়া যায়।

পেনড্রাইভ

২০০০ সালের দিকে যখন এগুলো বাজারে আসে তখন ৩২ মেগাবাইট তথ্য ধারণ করতে পারতো। এখন ১ টেরাবাইটের পেনড্রাইভ সহজেই পাওয়া যায়। মূল্যও আগের তুলনায় এখন হাতের নাগালে। এটি সিডি–ডিভিডির তুলনায় টেকেও বেশি দিন। তাই ব্যবহারকারীদের কাছে এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন ধরনের সুন্দর ডিজাইনের পেনড্রাইভ বাজারে পাওয়া যায়।

ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বা পেনড্রাইভ ছাড়াও বর্তমানে তথ্য সংরক্ষণের জন্য এক ধরনের মাইক্রোচিপ সংযুক্ত কার্ড ব্যবহার করা হয়। এগুলোর নাম মেমোরি কার্ড। মেমোরি কার্ডেও অনেক তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। তবে এটি সরাসরি সংযোগ দেওয়া যায় না। এর জন্য নির্ধারিত স্লট প্রয়োজন হয় অথবা কার্ড রিডার ব্যবহার করতে হয়। মেমোরি কার্ড নানা আকৃতি ও বিভিন্ন ক্ষমতার হতে পারে। তোমাদের অত্যন্ত প্রিয় এমপিথ্রি (mp3) বা এমপিফোর (mp4) প্লেয়ার এবং গেমস্ খেলার যন্ত্রগুলো ছাড়াও সকল ধরনের ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোনে এগুলোর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

দলগত কাজ

তথ্য সংরক্ষণের জন্য সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ অথবা মেমোরি কার্ডের মধ্যে কোনটিকে বেশি উপযোগী মনে কর? যুক্তিসহ বর্ণনা করো।

নতুন শিখলাম: গিগাবাইট, টেরাবাইট, অ্যালুমিনিয়াম এলয়, সিরামিক, পলিকার্বনেট, লেজার রশ্মি।

পাঠ ১২ ও ১৩: মাদারবোর্ড ও পাওয়ার সাপ্লাই

মাদারবোর্ড তোমাদের অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। ইতোমধ্যে মাদারবোর্ডের ছবিও দেখে ফেলেছ। তবু মাদারবোর্ড সম্পর্কে আরো জানা প্রয়োজন। যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র তোমরা যদি খুলে দেখ তাহলে একটা বোর্ড সবার নজরে পড়বে। এ বোর্ডটি আসলে একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড। এ বোর্ডে প্রায় সকল প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংযোগ দেওয়া থাকে। এ বোর্ড যন্ত্রাংশগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ছাড়াও বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখে। এ ধরনের বোর্ড আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে তার দিয়ে যন্ত্রাংশগুলোকে সংযোগ দেওয়া প্রয়োজন হতো। সে এক দেখবার মতো বিষয় ছিল!

কম্পিউটারের এই মাদারবোর্ড–মেইনবোর্ড, সিস্টেম বোর্ড আবার স্টিভ জবসের অ্যাপেল কম্পিউটারের

মাদারবোর্ড

ক্ষেত্রে লজিক বোর্ড নামেও পরিচিত। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এটা হচ্ছে কম্পিউটারের প্রসেসরের সাথে অন্যান্য ইনপুট, মেমোরি, আউটপুট বা স্টোরেজ ডিভাইসসহ সকল যন্ত্রপাতির সংযোগ রক্ষার বোর্ড।

এক সময় মাদারবোর্ডে প্রসেসর বা সিপিইউ সকেট ছাড়াও ভিডিও কার্ড, সাউন্ড কার্ড, র‍্যাম ইত্যাদি লাগানোর স্লট বা সকেট অবশ্যই দেখা যেত। তবে ইদানীং কালের মাদারবোর্ডে র‍্যাম ছাড়া অন্যান্য কার্ড (Built in) স্থায়ীভাবে সংযোজিত অবস্থায় থাকে। এতে করে কম্পিউটারের নির্মাণ ব্যয় অনেক কমে গেছে। তাছাড়া প্রসেসরের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে অনেক যন্ত্রাংশের কাজ প্রসেসর নিজেই করে থাকে।

মাদারবোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে সহায়ক চিপসেট (Chipset) যা সিপিইউ–এর সাথে অন্যান্য যন্ত্রপাতির কার্যক্রম সমন্বয় করে। মাদারবোর্ডের কাজ করার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য এ চিপসেটের উপরই নির্ভর করে। অর্থাৎ মাদারবোর্ডটি কোন ধরনের প্রসেসর ব্যবহার উপযোগী তা এ চিপসেটের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।

একটি আধুনিক মাদারবোর্ডে অন্যান্য যন্ত্রাংশের সাথে সাধারণত যা যা থাকে সেগুলো হলো :

১. মাইক্রোপ্রসেসর বা সিপিইউ সকেট
২. র‍্যাম স্লট
৩. চিপসেট
৪. রম
৫. ক্লক জেনারেটর
৬. এক্সপানশন স্লট এবং
৭. পাওয়ার সংযোগ স্লট।

এছাড়াও বর্তমানে মাদারবোর্ডের সাথে ইউএসবি (USB) পোর্ট, নেটওয়ার্কিং কার্ড ও পোর্ট ইত্যাদিও সংযোজিত অবস্থায় থাকে।

পাওয়ার সাপ্লাই (Power supply) :

তোমরা জান যে কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, তাই কম্পিউটারকে কর্মক্ষম করার জন্য বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করতে হয়। কম্পিউটারের মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্ক ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ কার্যক্ষম করার জন্য বিভিন্ন মাত্রার বিদ্যুৎশক্তির যোগান যে যন্ত্রাংশ থেকে পাওয়া যায় তাকে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট বলে। কম্পিউটারের এই পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট বিদ্যুৎ লাইনের এসি (অঙ্গ) বিদ্যুৎকে ডিসি (উঙ্গ) বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে। ডেস্কটপ কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের জন্য +১২ ভোল্ট থেকে +৩ ভোল্ট পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রার ডাইরেক্ট কারেন্ট বা ডিসি বিদ্যুৎ প্রয়োজন। এ জন্যই পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটে বিভিন্ন মাত্রার বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের কানেক্টর থাকে। ডেস্কটপ কম্পিউটারের জন্য বাজারে ২০০ ওয়াট থেকে ৮০০ ওয়াট পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট পাওয়া যায়। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের গুণগত মান ভাল না হলে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশের ক্ষতি হতে পারে।

পাওয়ার সাপ্লাই

দলগত কাজ

একটি পুরোনো নষ্ট কম্পিউটার খুলে মাদার বোর্ডটি লক্ষ করো এবং এঁকে এর বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত করো।

*কমপক্ষে একটি শ্রেণি কার্যক্রম এ কাজের জন্য বরাদ্দ করতে হবে।

নতুন শিখলাম : প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, Built in, Chipset, র‍্যাম স্লট, ক্লক জেনারেটর, এক্সপানশন স্লট, নেটওয়ার্কিং কার্ড, পাওয়ার সাপ্লাই।

পাঠ ১৪ : প্রসেসর

তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কোনটি– প্রায় সবাই বলবে মস্তিষ্ক। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের নির্দেশেই অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কাজ করে থাকে। তেমনি কম্পিউটার, মোবাইল ফোন বা এ ধরনের আইসিটি ডিভাইসগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রসেসর। একে সিপিইউ (CPU-Central Processing Unit) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশও বলা হয়। এখনকার দিনে গাড়ি, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, গেম কনসোল, টেলিভিশনসহ সব ধরনের হাইটেক যন্ত্রপাতিই প্রসেসর নিয়ন্ত্রিত।

আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি হলো এ প্রসেসর। আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে এর উন্নয়ন হয়েছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। বলা যায় অকল্পনীয় গতিতে। মজার ব্যাপার হলো প্রসেসরের উন্নয়নে প্রসেসরেরই সাহায্য নেওয়া হয়। তাই বলা যায় প্রসেসর নিজেই নিজেকে প্রতিনিয়ত উন্নত করে গড়ে তুলছে।

অসংখ্য ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) নিয়ে প্রসেসর তৈরি হয়। আইসিগুলো তৈরি হয় ট্রানজিস্টার (Transistor) দিয়ে। এগুলো সব একটি ক্ষুদ্র চিপ (Chip) এর মধ্যে থাকে। প্রসেসরে আইসির সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বাড়লেও চিপ–এর আকার ক্রমান্বয়ে ছোটো হয়ে আসছে। আকার ছোটো হলেও এর কাজ করার ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। কম্পিউটারের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকরণের কাজ সিপিইউ–এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সফটওয়্যারের নির্দেশ বোঝা এবং সে অনুযায়ী তথ্য প্রক্রিয়া করা এর কাজ। অর্থাৎ ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের কাজটি সিপিইউ বা প্রসেসর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এক কথায় কম্পিউটার–সংশ্লিষ্ট সকল যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারের নির্দেশনার মধ্যে সমন্বয় করে কাজ সমাধা করে প্রসেসর। তিনটি অংশের সমন্বয়ে প্রসেসর গঠিত হয়।

১. গাণিতিক যুক্তি ইউনিট (Arithmetic and Logic Unit): এ অংশে গাণিতিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তমূলক কাজ সংগঠিত হয়।

২. নিয়ন্ত্রক অংশ (Control Unit): এ অংশের মাধ্যমে সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ কোন নির্দেশের পর কোন নির্দেশ পালিত হবে তা নির্ধারিত হয় এ অংশে। এবং

৩. রেজিস্টার স্মৃতি (Register Memory): এটি ছোটো আকারের অত্যন্ত দ্রুতগতির অস্থায়ী মেমোরি বা স্মৃতি। এ স্মৃতি থেকে তথ্য নিয়ে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়।

আমরা জানি বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭১ সালেই ইন্টেল প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর উদ্ভাবন করে। যার নাম দেওয়া হয়েছিল ৪০০৪। এটির উদ্ভাবক ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেড হফ, স্ট্যান মেজর, ফেডরিকো ফ্যাগিন এবং জাপানের মাসাতোশি শিমা।

তোমরা আগেই জেনেছ জন্মের পর থেকেই প্রসেসরের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। ৪০০৪ মাইক্রোপ্রসেসরে ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ছিল ২৩০০টি আর বর্তমানের কোর আই সেভেন প্রসেসরের ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ২২৭,০০,০০,০০০টি! ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করো।

পৃথিবীর নানা জাতি–গোষ্ঠীর মানুষ যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে– আদেশ–নির্দেশ দেয় তার সবই কম্পিউটার ঠিক ঠিক পালন করে। কিন্তু কীভাবে সবার ভাষা কিংবা নির্দেশ কম্পিউটার বুঝে ফেলে?– এই প্রশ্নটির উত্তর জানার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের মন আঁকুপাঁকু করছে। এর সহজ উত্তর হচ্ছে কম্পিউটার তথা প্রসেসর আসলে কারও ভাষাই বোঝে না। সে তার নিজের ভাষাই শুধু বোঝে। কম্পিউটারের ভাষায় কেবল দুটো অক্ষর '০' এবং '১'। '০' মানে হচ্ছে ০ থেকে ২ ভোল্ট বিদ্যুৎ আর '১' মানে হচ্ছে ৩ থেকে ৫ ভোল্ট বিদ্যুৎ। এ ভাষার নাম মেশিন ভাষা (Machine Language)। ধরো, তুমি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারো কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি না জানা ফরাসি ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে চাও– এক্ষেত্রে একজন দোভাষীর সাহায্য নিয়ে কথা বলতে হবে। তেমনি প্রসেসরকে আমাদের ভাষা বোঝাতে অনুবাদক প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়।

প্রসেসর

আমাদের তথা পৃথিবীর তাবৎ ভাষার প্রতিটি অক্ষর ও প্রতীকের জন্য মেশিন ভাষার নির্দিষ্ট কোড রয়েছে। অনুবাদক প্রোগ্রাম আমাদের ভাষাকে প্রসেসর বা মেশিনের বোধগম্য কোডে রূপান্তর করে। নানা ধরনের কোড রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কোডের কথা উল্লেখ করা যায়। ASCII কোড ৮ বিটের কোড। এ কোড অনুযায়ী

A = ০১০০০০০১

B = ০১০০০০১০

? = ০০১১১১১১

, = ০০১০১১০০

ইত্যাদি। বর্তমানে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কোড হলো Unicode। তোমরা যখন প্রোগ্রামার হবে তখন অনেক ভাষার সাথে মেশিনের ভাষাও তোমাদের জানা হয়ে যাবে!

দলগত কাজ

প্রসেসরের ভাষা ও মানুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।

নতুন শিখলাম: IC, Transistor, Chip, Arithmetic and Logic Unit, Control Unit, Register Memory, ASCII কোড, Unicode.

পাঠ ১৫: ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস

সাউন্ড কার্ড (Sound Card): আজকের দিনের আইসিটি যন্ত্রগুলোতে যে যন্ত্রটি অবশ্যই থাকে তা হলো সাউন্ড কার্ড। এটি একই সাথে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। এটি সাধারণত সফটওয়্যার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

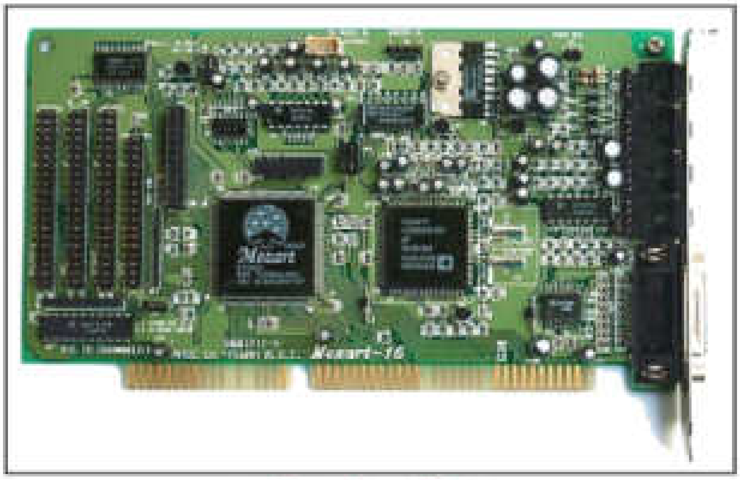

সাউন্ড কার্ড (মোজার্ট ১৬)

বেশিরভাগ সাউন্ড কার্ড ডিজিটাল উপাত্তকে এনালগ শব্দে রূপান্তর করে। আউটপুট সিগন্যালগুলোকে একটি অ্যামপ্লিফায়ারের সাথে যুক্ত করে হেডফোন বা স্পিকারের সাহায্যে শব্দ শোনা যায়। প্রায় সব সাউন্ড কার্ডেই ইনপুট দেওয়ার কানেক্টার এবং আউটপুট দেওয়ার কানেক্টার থাকে। বাইরে থেকে মাইক্রোফোন বা অন্য কোনো ইনপুট দেওয়ার যন্ত্রে ইনপুট দিলে সাউন্ড কার্ড তা প্রসেসরে পাঠায় এবং প্রসেসর সেই ইনপুটকে প্রক্রিয়া করে আবার সাউন্ড কার্ডে পাঠায়, সেখান থেকে আউটপুট অংশের মাধ্যমে হেডফোন বা স্পিকারে আমরা শব্দ শুনতে পাই।

ইদানীং কালে বেশিরভাগ সাউন্ড কার্ডই মাদারবোর্ডে সংযুক্ত (Built in) অবস্থায় থাকে। আলাদা করে সাউন্ড কার্ড লাগাতে হয় না। সাউন্ড কার্ডের মাধ্যমেই মাল্টিমিডিয়া পূর্ণতা পায়। গান শোনা, চলচ্চিত্র উপভোগ করা ছাড়াও সব গেমস্ আমরা শব্দসহ উপভোগ করি সাউন্ড কার্ডের কারনেই। তবে প্রফেশনাল কাজে ব্যবহৃত সাউন্ড কার্ড সাধারণত আলাদা করে মাদারবোর্ডে লাগাতে হয়।

গ্রাফিক্স কার্ড (Graphics Card): তোমরা যখন কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করো তখন পর্দায় ছবি দেখেই নানা নির্দেশনা দিয়ে থাক। এখন প্রশ্ন হলো এ ছবি পর্দায় দেখা যায় কীভাবে? আসলে কাজটি করে থাকে গ্রাফিক্স কার্ড। এটিকে অনেক সময় ভিডিও কার্ড, ডিসপ্লে কার্ড বা গ্রাফিক্স এডাপ্টার নামে ডাকা হয়।

মাদারবোর্ডে এই কার্ড লাগানোর জন্য আলাদা স্লট বা সকেট থাকে। বর্তমানে বেশিরভাগ মাদারবোর্ডেই এ কার্ড সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। আর অত্যাধুনিক প্রসেসরগুলোতে এ ভিডিও বা ডিসপ্লে চিপ সংযুক্ত থাকে বা অন্য কথায় প্রসেসরগুলো কোনো কার্ড ছাড়াই আমাদের ছবি প্রদর্শন করতে পারে।

সব গ্রাফিক্স কার্ডই আমাদের দ্বিমাত্রিক (২ডি) ছবি দেখাতে পারে। তবে বর্তমানে ত্রিমাত্রিক (৩ডি) ছবি দেখাতে সক্ষম গ্রাফিক্স কার্ডও পাওয়া যায়। অবশ্য ত্রিমাত্রিক ছবি দেখতে হলে আমাদের ত্রিমাত্রিক ছবি দেখাতে সক্ষম মনিটর প্রয়োজন হবে। গ্রাফিক্স কার্ডের এ উন্নতির ফলে আজকের দিনে আমরা একেবারে জীবন্ত ও বাস্তব ছবি দেখতে পারছি।

গ্রাফিক্স কার্ড

সাউন্ড কার্ডের মতো গ্রাফিক্স কার্ডেও ইনপুট ও আউটপুট কানেক্টার থাকে। এছাড়াও গ্রাফিক্স কার্ডে গেমস্ খেলার জন্য আলাদা পোর্ট থাকে। ফলে সহজেই গেমস্ খেলার জন্য জয়স্টিকস্ বা অন্যান্য যন্ত্র সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়।

টাচ স্ক্রিন (Touch screen):

তোমরা নিশ্চয়ই স্মার্ট ফোন বা টাচ ফোন ব্যবহার করতে দেখেছ। এই ধরনের ফোনে আঙুল স্পর্শ করে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ফলাফলও স্ক্রিনেই দেখা যায়। টাচস্ক্রিন হল এমন এক ধরনের ডিসপ্লে যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে টাচ বা আঙুলের স্পর্শ ইনপুট সনাক্ত করতে পারে এবং মনিটরের মত স্ক্রিনে ফলাফলও প্রদর্শন করতে পারে। এটি একটি ইনপুট ডিভাইস (টাচ বা স্পর্শ প্যানেল) এবং একটি আউটপুট ডিভাইস (ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে) উভয়ই নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ এটি ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস। টাচস্ক্রিন সাধারণত স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানায় অটোমেশন কাজে টাচস্ক্রিনের ব্যবহার দেখা যায়।

টাচ স্ক্রিন

দলগত কাজ

সাউন্ড কার্ড ও গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া আর কী ধরনের আউটপুট কার্ড হলে তোমাদের জন্য সুবিধা হয়? দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।

নতুন শিখলাম : এনালগ, অ্যামপ্লিফায়ার, এডাপ্টার, দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক।

পাঠ ১৬ ও ১৭: আউটপুট ডিভাইস

মনিটর (Monitor): মনিটর মূলত একটি আউটপুট ডিভাইস। এখন এমন মনিটরও পাওয়া যায় যা একইসাথে ইনপুট ডিভাইস হিসেবেও কাজ করতে পারে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছ এখানে টাচস্ক্রিন মনিটরের কথা বলা হচ্ছে। আজকাল টাচস্ক্রিনসহ মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট কম্পিউটার, ল্যাপটপ কিংবা সাধারণ মনিটর সবখানেই পাওয়া যায়। তোমাদের অনেকেই হয়তো এরমধ্যে এসব ব্যবহারও করে ফেলেছ।

সিআরটি মনিটর, এলসিডি মনিটর ও এলইডি মনিটর

আমাদের বাসার টেলিভিশনের সাথে মনিটরের তেমন পার্থক্য নেই। নানা আকৃতির মনিটর পাওয়া যায়। মনিটরের কর্ণের দৈর্ঘ্যকে মনিটরের সাইজ হিসেবে ধরা হয়। আগে সিআরটি বা ক্যাথোড রে টিউব (Cathod Ray Tube) মনিটরই সবাই ব্যবহার করত। এখন পাতলা এলসিডি (লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে) বা এলইডি (লাইট ইমিটিং ডায়োড) পর্দার মনিটর ব্যবহৃত হয়। এগুলো হালকা পাতলা। দেখতে আকর্ষণীয় এবং বিদ্যুৎ খরচ সিআরটি মনিটরের তুলনায় অনেক কম।

প্রিন্টার (Printer): মনিটরের পর যে আউটপুট যন্ত্রটি আমাদের বেশি প্রয়োজন হয় তা হচ্ছে প্রিন্টার। কম্পিউটারে প্রসেসিং করার পর এর আউটপুট কাগজে ছাপানোর জন্য আমাদের প্রিন্টার ব্যবহার করতে হয়। ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিও আমরা প্রিন্টারে প্রিন্ট করে থাকি। সাধারণত তিন ধরনের প্রিন্টার পাওয়া যায়।

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার

ক. ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার: এটি প্রথম দিকের প্রিন্টার। ছাপার ব্যয় অনেক কম সেজন্য এ প্রিন্টারটি এখনো অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে এটি দিয়ে নিখুঁত ছাপার কাজ করা যায় না। তাছাড়া এটির ছাপার গতি অনেক ধীর।

ইঙ্কজেট প্রিন্টার

খ. ইঙ্কজেট প্রিন্টার: স্বল্পদামি প্রিন্টার হিসেবে এটি বহুল ব্যবহৃত। সাধারণত ব্যক্তিগত কাজে ইঙ্কজেট প্রিন্টার বেশি ব্যবহার করা হয়। এটিতে তরল কালি ব্যবহৃত হয়। এটি দিয়ে নিখুঁত ছাপার কাজ করা যায়। বিশেষ করে ছবি প্রিন্ট করার কাজে ইঙ্কজেট প্রিন্টারের ব্যবহার অধিক। তবে এর ছাপার ব্যয় তুলনামূলক বেশি।

লেজার প্রিন্টার

গ. লেজার প্রিন্টার: নাম দেখে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ এর সাথে লেজারের সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের প্রিন্টারে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ছাপা হয়। লেজার প্রিন্টারের ছাপার গতি ও মান অত্যন্ত উন্নত ও নিখুঁত। সাধারণ ছাপা এবং ছবি প্রিন্ট উভয় ধরনের কাজেই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এক সময় ব্যয়বহুল থাকলেও প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে এটি এখন অনেক ব্যয়-সাশ্রয়ী।

এছাড়াও প্লটারও একটি ছাপার যন্ত্র। আর্কিটেকচারাল নকশা, মানচিত্র বা গ্রাফের নিখুঁত ও অনেক বড় কাগজে প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

দলগত কাজ

তোমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য কোন ধরনের প্রিন্টার উপযুক্ত, দলে আলোচনা করে যুক্তিসহ উপস্থাপন করো।

নতুন শিখলাম: সিআরটি বা ক্যাথড রে টিউব, এলসিডি বা লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে, এলইডি বা লাইট ইমিটিং ডায়োড, আর্কিটেকচারাল নকশা।

পাঠ ১৮ : আউটপুট ডিভাইস

স্পিকার

স্পিকার: তোমরা সবাই নিশ্চয়ই গান শুনতে অনেক পছন্দ কর। গান শোনার যন্ত্রগুলোর সাথে যা অবশ্যই সংযুক্ত থাকে তাই হলো স্পিকার। স্পিকার আমাদের সব ধরনের শব্দ শোনাতে পারে। এটি একটি আউটপুট ডিভাইস। মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটারের অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র হলো স্পিকার। স্পিকার কম্পিউটারের ভিতরে স্থাপিত অবস্থায় থাকতে পারে আবার বাইরে লাগানো যায়। ভালো মানের শব্দ পেতে হলে আমাদের ভালো স্পিকার ব্যবহার করতে হয়। সাউন্ড কার্ড বা রিসিভার থেকে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শ্রবণযোগ্য শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত করা স্পিকারের কাজ।

হেডফোন

হেডফোন: হেডফোন হলো কানের কাছাকাছি নিয়ে শব্দ শোনার যন্ত্র। একে অনেকে এয়ারফোন বা হেডসেট নামেও ডেকে থাকে। এটিও আউটপুট ডিভাইস। সাধারণত মোবাইল ফোন, সিডি/ডিভিডি প্লেয়ার, এমপিথ্রি/এমপিফোর প্লেয়ার, ল্যাপটপ বা পার্সোনাল কম্পিউটারের সাথে ব্যবহার করা হয়। একাকী ব্যবহার করা হয় বলে এতে অন্যের বিরক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে হেডফোনের বহুল ব্যবহার বিশেষ করে উচ্চশব্দে বাজানো থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

বর্তমানে তারবিহীন হেডফোন অনেকেই ব্যবহার করে। এগুলো ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের শব্দ শোনায়।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর হলো একটি ইলেকট্রো অপটিক্যাল যন্ত্র। এর সাহায্যে কম্পিউটার বা অন্য কোনো ভিডিও উৎস থেকে নেওয়া ডেটা ইমেজে রূপান্তর করা যায়। এ ইমেজ লেন্স পদ্ধতির মাধ্যমে বহুগুণে বিবর্ধিত করে দূরবর্তী দেয়ালে বা স্ক্রিনে ফেলে উজ্জ্বল ইমেজ তৈরি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। আধুনিক প্রজেক্টরগুলো ত্রিমাত্রিক ইমেজও তৈরি করতে সক্ষম।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সাধারণত প্রেজেন্টেশনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এগুলো স্লাইড প্রজেক্টর এবং ওভারহেড প্রজেক্টরের আধুনিক রূপ। এটি ডিজিটাল ইমেজকে যেকোনো সমতলে যেমন– দেয়াল বা

ডেস্কের উপর বড় করে ফেলতে সক্ষম। বিশাল সভাকক্ষে ব্যবহারের জন্য এর ঔজ্জ্বল্য এক হাজার থেকে চার হাজার লুমেন্সের হতে হয়। এটি ল্যাম্পের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

এলসিডি প্রজেক্টরগুলোর ল্যাম্প সাধারণত চার হাজার ঘণ্টা ব্যবহারের পর পরিবর্তন করতে হয়। আরেক ধরনের প্রজেক্টর রয়েছে যা এলইডি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এগুলোর ল্যাম্প বিশ হাজার ঘণ্টা কাজ করতে পারে। তবে এগুলোর মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। কম্পিউটার বা অন্য কোনো উৎস যেমন– টেলিভিশন, সিডি/ডিভিডি প্লেয়ার ইত্যাদি থেকে ইমেজ নিয়ে তা এলসিডিতে সরবরাহ করে। এরপর ইমেজটি একটি লেন্সের মাধ্যমে সমতল পৃষ্ঠের ওপর ফেলা হয়। এজন্য বড় কোনো আসবাবের প্রয়োজন পড়ে না। এলসিডি বা এলইডি প্রজেক্টর আকারে ছোট বলে খুব সহজেই বহনযোগ্য। বর্তমানে পকেট প্রজেক্টর পাওয়া যায় যা কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি বা মোবাইল ফোন থেকে ব্যবহারের সুবিধা দেয়।

দলগত কাজ

যে ডিভাইসগুলো আলোচনা করা হলো এর বাইরে তোমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করো।

নতুন শিখলাম: শব্দতরঙ্গ, ব্লুটুথ, ওয়াইফাই, লুমেন্স, এলসিডি, এলইডি।

নমুনা প্রশ্ন

১. তুমি একটি ছবির ডিজিটাল প্রতিলিপি করতে চাও। এক্ষেত্রে কম্পিউটারের কোন ডিভাইসটি ব্যবহার করবে?

ক. প্লটার খ. কী বোর্ড

গ. প্রিন্টার ঘ. স্ক্যানার

২. প্রসেসরকে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা যায় কারণ–

i. এটি মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে

ii. প্রসেসর কম্পিউটারের সকল কাজের নির্দেশনা দেয়

iii. এর মাধ্যমে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৩. তোমার ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি সেভ বা সংরক্ষণ করতে কোন ডিভাইসটি ব্যবহার করবে?

ক. রম খ. র‍্যাম

গ. প্রসেসর ঘ. হার্ডডিস্ক

৪. একসাথে সরাসরি ছবি দেখা ও কথা বলার জন্য কোন কোন ডিভাইস ব্যবহার করা হয়?

ক. মোবাইল ফোন ও ওয়েব ক্যামেরা খ. ওয়েব ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন

গ. কম্পিউটার ও মাইক্রোফোন ঘ. কম্পিউটার ও ওয়েব ক্যাম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মতিন সাহেবের বড় নাতনী কণা ল্যাপটপে বসে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট খেলা দেখছে। এ দেখে মতিন সাহেব তার নাতনীকে বললেন, 'তুই ল্যাপটপে স্যাটেলাইট সংযোগ নিয়েছিস?' কণা খেলাটি রেকর্ড করে রাখল।

৫. কণা খেলা দেখতে পারে–

i. ইন্টারনেট ব্যবহার করে

ii. ল্যাপটপে টিভি কার্ড সংযোগ করে

iii. টেলিভিশন–ল্যাপটপ সংযোগ করে

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. খেলাটি রেকর্ড করার সবচেয়ে সুবিধাজনক ডিভাইস কোনটি?

ক. হার্ডড্রাইভ খ. পেনড্রাইভ

গ. সিডি ঘ. ডিভিডি

৭. ৬ নং প্রশ্নের উত্তরটি পছন্দ করার কারণ ব্যাখ্যা করো।

....

তৃতীয় অধ্যায়

নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

১. মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;

২. সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত আইন ব্যাখ্যা করতে পারব;

৪. নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;

৫. মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে কার্টুন আঁকতে পারব।

পাঠ ১৯: সচেতন ব্যবহার

তোমাকে যদি একটা ছোট কাঠি দিয়ে একটা গাছের ডাল কাটতে বলা হয়– তুমি সারাদিন চেষ্টা করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বড়জোর গাছের বাকল একটুখানি তুলতে পারবে– তার বেশি কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তোমাকে যদি একটা ধারালো দা দেয়া হয়– কয়েক কোপ দিয়েই তমি গাছের ডালটা কেটে ফেলতে পারবে। এখানে একটা জিনিস লক্ষ করো, ছোট কাঠিটা যদি তুমি অসতর্কভাবে ব্যবহার কর তোমার হাতে পায়ে বড়জোর একটু খোচা লাগতে পারে– কিন্তু ধারালো দা অসতর্কভাবে ব্যবহার করলে ভুল জায়গায় কোপ লেগে ভয়াবহ রক্তারক্তি হয়ে যেতে পারে।

সবার চোখের আড়ালে থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করবে না

ছোট কাঠি থেকে ধারালো দায়ের ক্ষমতা অনেক বেশি তাই সচেতনভাবে সেটা ব্যবহার করে অনেক বড় কাজ করা যাবে– কিন্তু অসচেতনভাবে সেটা ব্যবহার করলে অনেক বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে। এটা সবসময় মনে রাখবে– জীবনের সবকিছুর বেলাতেও এটা সত্যি। সবচেয়ে বেশি সত্যি এটা তথ্য প্রযুক্তির বেলায়– প্রযুক্তির ক্ষমতা কত সেটা নিশ্চয়ই তুমি এখন অনুমান করতে শুরু করছো, তাই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটাকে ভুল করে ব্যবহার করলে অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

অপরিচিত মানুষকে নাম-পরিচয়-ছবি পাসওয়ার্ড দেবে না

কাজেই প্রথমেই আমাদের একটা জিনিস খুব ভালো করে শিখে নিতে হবে, আমরা কম্পিউটার, ইন্টারনেট, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করব– কিন্তু সেটি ব্যবহার করব খুব সচেতনভাবে যেন কখনো কোনো সমস্যা না হতে পারে। অনেকের কাছেই কম্পিউটারের মূল ব্যবহার হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেটের ব্যবহার। এই ইন্টারনেটে পৃথিবীর সব কম্পিউটার যুক্ত আছে তাই কেউ যখন ঘরের ভেতরে বসে কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তখন হঠাৎ করে পুরো পৃথিবীটা যেন তোমার ছোটো ঘরের ভেতর হাজির হয়। এই পৃথিবীতে যেরকম অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে– যেখানে তোমাদের যেতে ইচ্ছে করে, ঠিক সেরকম অনেক ভয়ংকর বিপজ্জনক জায়গা আছে– যেখান থেকে তোমার একশ হাত দূরে থাকতে হবে। ইন্টারনেটের বেলাতেও তোমাদের সাথে একই ব্যাপার ঘটে, তোমার চোখের সামনে অনেক চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে যেটা তুমি উপভোগ করবে আবার তার পাশাপাশি অনেক বিপজ্জনক ওয়েবসাইট রয়েছে যেগুলো কোনোভাবেই তোমার দেখা উচিত না।

শুধু যে ওয়েবসাইট তা নয়, ইন্টারনেট ব্যবহার করে তুমি যখন অন্যদের সাথে যোগাযোগ করো তখন হঠাৎ করে শুধু পরিচিত মানুষ নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সাথেও যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে। না বুঝে কোনো অপরিচিত মানুষের সাথে সরল বিশ্বাসে যোগাযোগ করে তুমি যদি আবিষ্কার করো মানুষটি আসলে একটা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্টারনেটে হানা দিয়েছে? মানুষটিকে তুমি যদি তোমার নাম ঠিকানা, ফোন নম্বর, ছবি দিয়ে বসে থাকো আর সেই মানুষটি যদি সেগুলো কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তখন তুমি কী করবে?

ইন্টারনেটে অন্যের সাথে রূঢ়, অসংযত, অশালীন হবে না

কাজেই কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করার প্রথম নিয়মটিই হচ্ছে কখনো অপরিচিত মানুষকে নিজের পরিচয়, নাম, ঠিকানা আর পাসওয়ার্ড দিতে হয় না।

ইন্টারনেটে অপরিচিত মানুষদের সাথে যোগাযোগ করলে অনেক রকম বিপদ হতে পারে, যেহেতু কেউ দেখছে না, তাই তাদের কথাবার্তা অনেক সময় অসংযত হয়ে যেতে পারে, শালীনতা ছাড়িয়ে যেতে পারে। সত্যিকার জীবনে আমি যদি অসংযত বা অশালীন ব্যাপার না দেখি তাহলে সাইবার জগতে কেনো সেটি দেখব?

সবকিছুতেই বয়সের একটা ব্যাপার আছে– তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ তোমার বয়সি ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা বইগুলো পড়তে তোমার ভালো লাগে, বড়দের জন্য লেখা বইগুলো তত ভালো নাও লাগতে পারে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় সেটা পড়তে গিয়ে তার বিষয়বস্তুর কারণে তুমি রীতিমতো ধাক্কা খেতে পারো। সাইবার জগতে সেটা হতে পারে, হঠাৎ করে তোমার সামনে যদি এমন কিছু চলে আসে যেটা মোটেও তোমার বয়সের উপযোগী না, তুমি রীতিমতো ধাক্কা খেতে পারো– তোমার মনটাই বিষিয়ে যেতে পারে। কাজেই সতর্ক থাকা ভালো।

তোমরা যারা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করো তারা নিচের তিনটি নিয়ম মেনে চলবে, দেখবে কখনো কোনো সমস্যা হবে না।

(১) ইন্টারনেট কখনো একা অন্যদের চোখের আড়ালে ব্যবহার করবে না, এমন জায়গায় বসে ব্যবহার করবে যেখানে সবাই তোমার কম্পিউটারের স্ক্রিন দেখতে পায়।

(২) ভুলেও কোনো অপরিচিত মানুষকে নিজের নাম, পরিচয়, ছবি বা পাসওয়ার্ড দেবে না।

(৩) ইন্টারনেট ব্যবহার করবে আনন্দের জন্য, কারো ক্ষতি করার জন্য নয়– তোমাকে হয়তো দেখছে না তবুও কখনো অসংযত হবে না, রূঢ় হবে না, অশালীন হবে না।

দলগত কাজ

(১) কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ছাড়াও তোমার জীবনে ব্যবহার করা আর কী কী প্রযুক্তি সচেতনভাবে ব্যবহার করা উচিত তার একটা তালিকা করো।

(২) ইন্টারনেট ব্যবহার করার তিনটি নিয়ম লিখে একটি সুন্দর পোস্টার তৈরি করো।

নতুন শিখলাম: সাইবার জগৎ, বিপজ্জনক ওয়েবসাইট, পাসওয়ার্ড।

পাঠ ২০–২২: আসক্তি

২০০৯ সালে চীন দেশে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, সম্পর্কে তারা স্বামী–স্ত্রী। তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারণ তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বিক্রি করে দিয়েছে। সবমিলিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তারা তাদের তিন ছেলেমেয়েকে বিক্রি করেছে আনুমানিক ৯০০০ ডলারে। তোমরা যারা খবরের কাগজ পড় মাঝে মাঝে আমাদের দেশেও হয়তো এরকম খবর তোমাদের চোখে পড়েছে, যেখানে কোনো একজন অসহায় মা, নিজের সন্তানদের মানুষ করার সামর্থ্য নেই বলে কিছু অর্থের বিনিময়ে অন্য কাউকে তার নিজের সন্তানকে দিয়ে দিচ্ছে। আমরা যখন এরকম খবর পড়ি, তখন আমাদের মন খারাপ হয়। আমরা তখন স্বপ্ন দেখি ভবিষ্যতে আমাদের দেশটি এমন একটি দেশ হবে যেখানে আর কখনো কোনো অসহায় মা'কে এরকম কিছু করতে হবে না।

চীন দেশের স্বামী–স্ত্রীর ঘটনা কিন্তু মোটেও সেরকম কোনো ঘটনা নয়– তারা তাদের বাচ্চাদের বিক্রি করেছে কম্পিউটার গেম খেলার জন্য। তাদের দুজনেরই এমএমও (Massively multiplayer online game) নামে এক ধরনের কম্পিউটার গেম খেলার জন্যে আসক্তি জন্মেছে, সেই আসক্তি এত তীব্র যে সেটি খেলার খরচ জোগাড় করার জন্যে তারা তাদের নিজের সন্তানদের বিক্রি করে দিয়েছে।

নিউজ মিডিয়াতে চীন দেশের এক দম্পতির সন্তান বিক্রি করে দেয়ার খবর

এটি খুবই একটি অস্বাভাবিক ঘটনা এবং যখন এই ঘটনাটি সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয় তখন এটা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল। পৃথিবীর মানুষ তখন আতঙ্কিত হয়ে আবিষ্কার করেছিল যে কম্পিউটার গেমে এমন আসক্তি হতে পারে। এ আসক্তির জন্য সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত উধাও হয়ে যায়। আমাদের সবারই এটা মনে রাখা দরকার। কোনো কিছু ভালোলাগা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, আমাদের জীবনে অনেক কিছুই আমাদের ভালো লাগে, আমরা ভালো লাগার কাজটি করার চেষ্টা করি, তাই আমাদের জীবন এত সুন্দর। কিন্তু আসক্তি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। তার মাঝে ভালো কিছু নেই! কেউ যখন কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে যায় তখন তার কাছে যুক্তি কাজ করে না। সে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে সেই কাজটি করতে থাকে। মাদক হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ– যখন কেউ মাদকে আসক্ত হয়ে যায় তখন সে তার ভয়ংকর আকর্ষণ থেকে বের হতে পারে না। তার নিজের এবং আশপাশে যারা আছে তাদের সবার জীবন সে ধ্বংস করে দেয়।

কম্পিউটার গেমের আসক্তিও ঠিক সে ধরনের হতে পারে। তোমরা যারা কম্পিউটার গেম খেলেছ কিংবা যারা হয়তো ভবিষ্যতে কম্পিউটার গেম খেলবে তাদের এই কথাটা মনে রাখতে হবে– তোমরা যেন বিষয়টা উপভোগ করতে পারো কিন্তু কোনোভাবেই যেন আসক্ত না হয়ে পড়ো।

ছোট শিশুরা সহজেই কার্টুনে আসক্ত হয়ে যেতে পারে।

কোনো একটা বিষয়ে আসক্ত হয়েছ কি না সেটা কীভাবে বোঝা সম্ভব? কাজটি মোটেও কঠিন নয়– যখনই দেখবে কেউ একজন কোনো একটি কাজে মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলছে তখনই বুঝবে সে সেই কাজে আসক্ত হয়ে গেছে। আমাদের দেশে টেলিভিশনে অনেক রকম কার্টুন দেখায়– তোমরা সবাই সেইসব কার্টুন দেখেছ, দেখে হয়তো হাসিতে কুটি কুটি হয়েছ। যখন টেলিভিশনের সামনে থেকে উঠে এসেছ সেই কার্টুনের কথা ভুলে অন্য কোনো কাজে মন দিয়েছ। কিন্তু যদি এরকম হয় যে তুমি টেলিভিশন ছেড়ে উঠতে পারছো না কিংবা যখনই টেলিভিশনের সামনে আসো তখনই টেলিভিশনে কার্টুন দেখ এবং তোমার জন্য অন্যেরা টেলিভিশনে অন্য কিছু দেখতে পারে না তখনই তুমি বুঝবে যে তোমার আসক্তি জন্মাতে শুরু করেছে। তোমার তখনই সতর্ক হওয়া দরকার। অনেক বাসাতে বাবা–মায়েরা এই বিষয়টি ভালো করে বোঝেন না। তারা ছোট বাচ্চাদের শান্ত রাখার জন্যে কার্টুন চ্যানেল খুলে টেলিভিশনের সামনে বসিয়ে রেখে দেন। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন হয়ে যায় যে ছোট বাচ্চাটি কার্টুন ছাড়া আর কিছু বুঝতেই পারে না। তাকে টেলিভিশনের সামনে থেকে সরানো যায় না এবং এটি বাচ্চাটির মানসিক বিকাশে অনেক বড় সমস্যা হতে পারে।

শুধু যে কার্টুন চ্যানেল বা কম্পিউটার গেমে আসক্তি হতে পারে তা নয়, কোনো এক ধরনের খাবারেও আসক্তি হতে পারে। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখা গিয়েছে ব্রিটেনের একটি মেয়ে পিৎজা ছাড়া আর কোনো কিছু খেতে পারে না। গত একত্রিশ বছর থেকে সে সকালের নাস্তায়, দুপুরের লাঞ্চ, রাতের ডিনার বা দুটো খাবারের মাঝখানে কিছু খেলেও সে শুধু পিৎজা খায়। সে যেহেতু আর কিছু খায় না, খেতে পারে না। তাই এটাও খুব বড় ধরনের আসক্তি।

কাজেই তোমাদের সবারই খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনো কিছুতে তোমাদের আসক্তি জন্মে না যায়। যেহেতু একবার আসক্তি হয়ে গেলে সেখান থেকে বের হওয়া অসম্ভব কঠিন। তাই সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোনো কিছুতেই কোনোভাবে আসক্ত না হওয়া।

দলগত কাজ

কম্পিউটার গেমের আসক্তির ভয়াবহতা নিয়ে একটি নাটক লিখে সবাই মিলে অভিনয় করো।

এক সময় আসক্তি শব্দটা ব্যবহার করা হতো জুয়া খেলা বা মাদক ব্যবহার এরকম বিষয়ের জন্য। তোমরা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হবে যে এখন অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারও আসক্তি হিসেবে ধরা শুরু হয়েছে। যারা খুব বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের জন্যে IAD বা Internet Addiction Disorder নামে একটা নতুন নাম পর্যন্ত আবিষ্কার করা হয়েছে।

আজকাল অনেকেই কমবেশি কম্পিউটার ব্যবহার করে। কাজেই, প্রথমেই বুঝতে হবে কোন ব্যবহারটা হচ্ছে প্রয়োজনে আর কোনটা হচ্ছে আসক্তিতে। একজন যখন তার মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবকে সময় না দিয়ে সেই সময়টাও কম্পিউটারের পেছনে দেয় তখন বুঝতে হবে তার কম্পিউটারে আসক্তি জন্মেছে। যখন কম্পিউটারে আসক্তি হবে তখন দেখা যাবে তার কাজকর্মে ক্ষতি হচ্ছে, লেখাপড়ায় সমস্যা হচ্ছে। যখন আসক্তি আরওবেড়ে যাবে তখন দেখা যাবে মানুষটি ঠিকমতো না ঘুমিয়ে সেই সময়টা কম্পিউটারের পিছনে বসে আছে– তখন তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে শুরু করে। যেহেতু কম্পিউটার নিয়ে সাধারণ মানুষের খুব ভালো ধারণা নেই তাই অনেক সময় বাবা–মায়েরা কম্পিউটারের আসক্তির ব্যাপারটা বুঝতে

আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করব কিন্তু কম্পিউটার যেন আমাদের ব্যবহার করতে না পারে

পারেন না। কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি ভালো নয়, কম্পিউটার ব্যবহারেরও নয়, এটি সবাইকে বুঝতে হবে।

কম্পিউটার আসক্তির কুফল কী হতে পারে? কিছু কিছু বিষয় খুব স্পষ্ট। কম বয়সি ছেলেমেয়েদের বেড়ে উঠার জন্য মাঠে ঘাটে ছোটাছুটি করতে হয়, খেলতে হয়। যে সময়টা খেলার মাঠে ছোটাছুটি করে খেলার কথা, সেই সময়টাতে তারা যদি ঘরের কোনায় কম্পিউটারের সামনে মাথা গুজে বসে থাকে তাহলে সেটা তার জন্য মোটেই ভালো একটি ব্যাপার নয়। যারা সত্যিকারভাবে কম্পিউটারে আসক্ত হয়ে যায়, দেখা যায় তারা কম্পিউটারের বাইরে চিন্তাও করতে পারে না। তারা শুধু যে সেটা নিয়ে সময় কাটায় তা নয়, সেটার পেছনে নিজের কিংবা বাবা–মায়ের টাকাও খরচ করাতে শুরু করে।

যেকোনো আসক্তির জন্য একটা কথা সত্যি, একবার কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে যাওয়ার পর সেটা থেকে বের হয়ে আসা খুব কঠিন। কাজেই তোমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদের সবারই জানতে হবে

কম্পিউটার খুব চমৎকার একটা যন্ত্র, তার ব্যবহার যেন হয় প্রয়োজনে– কখনোই যেন তাতে আসক্তি জন্মে না যায়।

কখনো যদি সত্যি সত্যি আসক্তি জন্মেই যায় তখন সেখান থেকে তাকে বের করে আনার জন্য সবারই একটা দায়িত্ব থাকে। সেজন্য যে মানুষটির কম্পিউটারে আসক্তি জন্মেছে তাকে কম্পিউটারের বাইরের জগৎ থেকেও আনন্দ পাওয়া শিখিয়ে নিতে হবে– সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হচ্ছে খেলাধুলা। যার আসক্তি জন্মেছে তাকে সময় ঠিক করে নিতে হবে– দিনে কতক্ষণ সে কম্পিউটার ব্যবহার করবে। যেমন– এক ঘণ্টার বেশি নয়। শুধু তাই নয়, অন্য কোনো একটি কাজ করে তাকে কম্পিউটার ব্যবহারের সেই সময়টুকু অর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে– কম্পিউটার খুব চমৎকার একটা যন্ত্র। আমরা সেটাকে– ব্যবহার করব, কিন্তু সেটা যেন কখনো আমাদের ব্যবহার না করে।

দলগত কাজ
কম্পিউটারে আসক্ত একটি ছেলে বা মেয়ে সারাদিন কীভাবে দিন কাটায়, সেটি নিয়ে একটি কাল্পনিক গল্প লেখো।

আজকাল তথ্য প্রযুক্তির জগতে নতুন এক ধরনের আসক্তি দেখা দিয়েছে সেটার নাম হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। এরকম অনেক ধরনের সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক রয়েছে, যেমন– ফেসবুক, এক্স, লিংকডইন, ইউটিউব ইত্যাদি। ফেসবুক ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ। এই মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে এবং এর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে।

এত বিশাল সংখ্যক মানুষ যে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তার গুরুত্বটা নিশ্চয়ই খুব সহজে বোঝা যায়। মানুষের ভেতরে কোনো একটা তথ্য ছড়িয়ে দেবার জন্যে এই নেটওয়ার্কগুলোর কোনো তুলনা নেই। পৃথিবীর অনেক দেশে গণতন্ত্র নেই বলে সরকার জোর করে দেশটাকে শাসন করে এবং অনেক সময় এই সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সাধারণ জনগণ সংগঠিত হয় এবং রীতিমতো আন্দোলন শুরু করতে পারে। তোমরা শুনে অবাক হবে আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশের স্বৈরশাসক বা সামরিক শাসককে আন্দোলন করে সরিয়ে দেয়ার পিছনে এই সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। আমরা যখন অনেক মানুষের কাছে কোনো খবর পাঠাতে চাই তখন মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য মানুষের কাছেই এই সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তথ্যগুলো পাঠিয়ে দেয়া যায়।

সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আজকাল মানুষজন একে অন্যের সাথে সম্পর্ক বা যোগাযোগ রাখে। কমবয়সিরা তথ্য প্রযুক্তিকে খুব সহজে গ্রহণ করতে পারে বলে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো কমবয়সিদের মাঝে খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত একটা নির্দিষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত এই নেটওয়ার্কে যোগ দেয়া যায় না কিন্তু তারপরেও অনেক কমবয়সিরাও নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দিয়ে দেয় এবং সেটা থামানোর খুব সহজ উপায় নেই। তোমরা হয়তো যুক্তি দিতে পারো কোনো একটা বিষয় যদি ভালো হয় তাহলে ছোটরা সেটাতে যোগ দিলে ক্ষতি কী? আমরা তো কমবয়সিদের খবরের কাগজ পড়তে নিষেধ করি না, টেলিভিশন দেখতে বাধা দিই না তাহলে সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দিতে আপত্তি করব কেন?

এর অবশ্যই কয়েকটা কারণ আছে, প্রথম কারণ হচ্ছে এই সামাজিক নেটওয়ার্কে একজন আরেকজনকে সামনাসামনি দেখতে পায় না তাই ছোটরা তাদের সাথে সামাজিকভাবে মিশছে তা অনেক সময় বোঝা যায় না। একটা মানুষ যখন শিশু থেকে বড় হয় তখন সব সময়েই সে তার নিজ বয়সিদের সাথে সময় কাটায় এবং সেটাই হচ্ছে সঠিক, তাই যদি কখনো দেখা যায় কমবয়সি ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক বড় মানুষদের সাথে ওঠাবসা করছে তখন সেটা কমবয়সি ছেলেমেয়েদের জন্যে ভালো নাও হতে পারে।

শুধু ছোট ছেলেমেয়ে নয়, বড়দের জন্য যেটা এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে এই সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্তি। অনেক সময় দেখা গিয়েছে মানুষজন এই সামাজিক নেটওয়ার্কে বসে একজন আরেকজনের সাথে তথ্য বিনিময় করছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুরো বিষয়টা এত সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, কোনো মানুষ সত্যিকার অর্থে কোনো কাজ না করে ঘন্টার পর ঘন্টা সামাজিক নেটওয়ার্কের পরিচিত, অর্ধ–পরিচিত কিংবা অপরিচিত মানুষের সাথে কাটিয়ে দিতে পারে। বিষয়টা বড় সমস্যা হয়ে গেছে বলে অনেক জায়গাতে অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে এটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জোর করে কোনো কিছু ব্যবহার করতে না দেয়া এক ধরনের সমাধান হতে পারে কিন্তু সেটা ভালো সমাধান না। ভালো সমাধান হচ্ছে যখন কোনো মানুষ তার নিজের বিচার বিবেচনা বুদ্ধি দিয়ে কোনো কিছু পরিমিতভাবে করে। আসক্ত হয়ে লাগাম ছাড়াভাবে তা করে না।

সামাজিক নেটওয়ার্কের বন্ধু আর সত্যিকারের বন্ধুর মাঝে অনেক পার্থক্য।

সামাজিক নেটওয়ার্কে থেকে মানুষজনের অসামাজিক হয়ে যাবারও এক ধরনের আশঙ্কা থাকে। যারা একে অন্যের সাথে সামাজিক নেটওয়ার্ক করে তারা অনেক সময় নিজেরা একে অন্যকে "বন্ধু" বলে বিবেচনা করে এবং সামাজিক নেটওয়ার্কে একজন আরেকজনের কাছে তথ্য পাঠানোকেই বন্ধুত্ব বলে মনে করে। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুত্ব আরো অনেক গভীর অনেক বেশি আন্তরিক, অনেক বেশি বাস্তব। কাজেই, তথ্য প্রযুক্তির বন্ধুত্বকে সত্যিকার বন্ধুত্ব মনে করে কেউ যদি তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে তার জীবনের অনেক বড় কিছু থেকে বঞ্চিত হবে।

দলগত কাজ

ক্লাসের দুটি দলে ভাগ হয়ে তোমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দেয়ার পক্ষে এবং বিপক্ষে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

নতুন শিখলাম: এমএমও, আসক্তি, Addiction, Disorder, IAD, স্বৈরশাসক, ফেসবুক, এক্স, লিংকড্ইন।

পাঠ ২৩: কপিরাইট

মানুষের জীবনযাপনে দুই ধরনের সম্পদের প্রয়োজন হয়। এর একটি আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি যেটি স্পর্শ করা যায়, যেমন বাড়ি, গাড়ি, টাকাপয়সা, জামা কিংবা খাবার। এগুলো মানুষের জাগতিক, তবে শুধু এসবেই মানুষ তৃপ্ত থাকে না। তাকে তার মানবিক গুণকেও লালন করতে হয়। সে গান শোনে, কবিতা আবৃত্তি করে,গবেষণা করে, সৃষ্টিশীল কাজ করে, নতুন নতুন পণ্য ও সেবা দিয়ে মানুষের জীবনকে সহজ করে। এসব বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের মাধ্যমেও সম্পদ সৃষ্টি হয় যাকে আমরা বলতে পারি বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ। মানুষ স্বভাবতই তার সব ধরনের সম্পদকে আঁকড়ে রাখতে চায়, রক্ষা করতে চায়। বস্তুজগতের সম্পত্তিগুলো এমন যে, কেউ চাইলেই সেটি নিয়ে যেতে পারে না, বা আরেকটা একই রকমভাবে বানাতে পারে না। কোনো লোক ইচ্ছে করলে কি আলাদিনের দৈত্যকে দিয়ে তোমার বাড়িটা তুলে নিয়ে যেতে পারবে? পারবে না। কারণ সেটি একদিকে সম্ভব নয় আবার অন্যদিকে আইনও সেটা করতে দেবে না। অথচ ধরো তুমি সুন্দর একটি গান লিখে সেটিতে সুর করলে। তারপর তোমার বন্ধুদের শোনালে। তখন তোমার বন্ধুদের একজন ইচ্ছে করলে সেটি অন্যদের কাছে নিজের গান বলে চালিয়ে দিতে পারে। আবার নিজের নামে দাবি না করলেও এমনকি তোমার অনুমতি ছাড়া সেটি সে বিভিন্ন স্থানে গাইতে পারে। তুমি একটা সুন্দর কবিতা লিখলে, সেটিও কেউ একজন তোমার অনুমতি ছাড়া কোথাও ছাপিয়ে দিতে পারে। এরকম যদি হয় তাহলে সেটি সমাজের জন্য সুন্দর হয় না। কারণ এর ফলে যারা সৃজনশীল কাজ করে তারা তাদের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। এমনকি এর জন্য যদি তাদের কোনো আর্থিক লাভ হওয়ার কথাথাকে সেটাও হয় না। আমরা একটি গল্পের বইয়ের উদাহরণ থেকে এই ব্যাপারটি আরেকটু ভালো করে বুঝতে পারব। একজন লেখক তার শ্রম, সময় এবং চিন্তা দিয়ে বইটি লিখেন। এরপর একজন প্রকাশক বইটি প্রকাশ করেন। তিনি বাজার থেকে কাগজ কিনে, বইটি ছাপিয়ে, বাঁধাই করে, বিভিন্ন বিক্রেতার মাধ্যমে আমাদের কাছেপৌঁছে দেন। স্বভাবতই এ কাজে তার যে খরচ হয় সেটি ধরে নিয়ে তিনি বইয়ের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করেন। এর মধ্যে একটি অংশ লেখক পান যাকে বলা হয় রয়্যালটি। এখন যদি কেউ লেখকের অজান্তে তার বই বের করে ফেলে তাহলে লেখক তার এই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হন। কাজেই এমন একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার, যেটি সৃজনশীল কর্মের যারা স্রষ্টা তাদের এই অধিকার অক্ষুণ্ণ বা বজায় রাখে। পৃথিবীর দেশে দেশে তাই সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের কপি বা পুনরুৎপাদন, অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের জন্য আইনের বিধান রাখা হয়। যেহেতু এই আইন কপি বা পুনরুৎপাদনের অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে তৈরি তাই এটিকে কপিরাইট (Copyright) আইন বা সংক্ষেপে কপিরাইট বলে।

মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর বই কপি করা বা নকল করাটা সহজ হয়ে গিয়েছে। লেখকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যে ১৬৬২ সালে কপিরাইট আইন (Licensing of the Press Act 1662) পার্লামেন্টে পাস করে। এই আইনের আওতায় যারা তাদের বইয়ের অননুমোদিত কপি করা বন্ধ করতে চায় তারা তাদের বই রেজিস্ট্রেশন করে একটা লাইসেন্স নিত। বই দিয়ে সূচনা হলেও পরে দেখা যায় সৃজনশীল কর্মের অন্যান্য প্রকাশেরও সংরক্ষণ প্রয়োজন। তখন বিভিন্ন আবিষ্কার, ব্যবসার মার্কা ইত্যাদিও বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ বা মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের আওতায় চলে আসে। কম্পিউটার আবিষ্কারের পর দেখা গেল বই, ছবি বা অনুরূপ কর্মের পুনরুৎপাদন খুবই সহজ। আর ইন্টারনেটের আবিষ্কারের পর দেখা গেল তা সারা দুনিয়াতেই ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কাজেই কম্পিউটারের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন এবং বিতরণও এখন এই আইনের আওতায় চলে এসেছে। একই সঙ্গে কম্পিউটারের প্রোগ্রামও যেহেতু একটি সৃজনশীল

২০১৫

কর্মকাণ্ড, তাই এই আইনের আওতায় এর স্রষ্টা তার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারেন। বর্তমানে যেসব দেশে এই আইন আছে সেসব দেশে সৃজনশীল কাজের কপিরাইট স্রষ্টার মৃত্যুর পরও বলবৎ থাকে। এটি কোনো কোনো দেশে এমনকি ১০০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তবে সাধারণত এটি লেখক, শিল্পী, নাট্যকারের মৃত্যুর পর ৫০ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। বাংলাদেশের কপিরাইট আইনে (কপিরাইট আইন ২০০০) এর মেয়াদ ৬০ বছর। যখন কোনো সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট ভঙ্গ করে সেটি পুনরুৎপাদন করা হয় তখন সেটিকে বলা হয় চোরাই (Pirated) কপি। যেহেতু কম্পিউটারের বিষয়গুলো সহজে কপি করা যায় তাই এগুলোর চোরাই কপি পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় আমাদের এই বিষয়টি সব সময় খেয়াল রাখতে হয়। আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু কম্পিউটার থেকে কপি করে দেব তখন যেন কপিরাইট আইন ভঙ্গ না করি। শুধু কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা গেমস নয়, আমাদের কম্পিউটারে অনেক সময় অনেক ছবি থাকে, অনেকের গল্প-কবিতাও থাকে। আমরা যখন কাউকে সেটা কপি করে দেব তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সেগুলো কপি করে অন্যকে দেওয়ার অধিকার নেই। তবে সৃজনশীল কর্ম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্বাধীনতাও থাকে। বিশেষ করে, একাডেমিক বা পড়ালেখার কাজে সৃজনশীল কাজ কপি করা যায়। পড়ালেখার কাজে আমরা কোনো বইয়ের যে ফটোকপি করি, তা কপিরাইট আইন ভঙ্গ করে না। এরকম ব্যবহারকে বলা হয় 'ফেয়ার ইউজ'।

কপিরাইটের এই সংরক্ষণবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে একটি ভিন্নধর্মী ধারণাও বর্তমানে বেশ চালু হয়েছে। এর মূল কথা হলো কোনো লেখক, শিল্পী, প্রোগ্রামার বা নাট্যকার ইচ্ছে করলে তার সৃষ্ট সৃজনশীল কর্মকে শর্তসাপেক্ষে কপি করার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারেন। এই দর্শনকে বলা হয় মুক্ত দর্শন বা ওপেন সোর্স ফিলসফি (Open Source Philosophy)। যারা এই দর্শনের অনুসারী তারা তাদের সৃজনশীল কর্মকে কয়েকটি লাইসেন্সের মাধ্যমে সবাইকে ব্যবহার করতে দেন। এর মধ্যে কপিরাইটের একেবারে উল্টোটি হলো কপিলেফট (Copyleft)। যার অর্থ সৃজনশীল কর্মের স্রষ্টা সবাইকে এই কাজ কপি করার সানন্দ অনুমতি দিয়ে দিচ্ছেন। কপিরাইট আর কপিলেফটের মাঝখানে রয়েছে সৃজনী সাধারণ বা ক্রিয়েটিভ কমন্স (Creative Commons)। সৃজনী সাধারণ লাইসেন্সের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মস্রষ্টার কিছু কিছু অধিকার সংরক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন- যে কেউ ইচ্ছে করলে লেখকের বই তার লিখিত বা কোনো আইনি অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ করতে পারবে। তবে লেখকের নামে প্রকাশ করতে হবে বা সেটি দিয়ে কোনো মুনাফা লাভ করা যাবে না। মুক্ত দর্শনের আওতায় যে কম্পিউটার সফটওয়্যারগুলো প্রকাশিত হয় সেগুলোকে একত্রে মুক্ত সফটওয়্যার বা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (Open Source Software) বলা হয়। এই সফটওয়্যারগুলো সহজে একজন অন্যজনকে কপি করে দিতে পারে, ব্যবহারও করতে পারে। তবে যেহেতু সবাই কপি এবং পরিবর্তন করতে পারে তাই সারাবিশ্বের লোকেরা মিলে এই সফটওয়্যারগুলোকে খুবই শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলে। এই দর্শনের আর একটি বড় প্রকাশ হলো মুক্ত জ্ঞানভান্ডার উইকিপিডিয়া (www.wikipedia.org)। সবাই মিলে ইন্টারনেটে এই মুক্ত জ্ঞানকোষ গড়ে তুলেছে কয়েকটি মুক্ত লাইসেন্সের আওতায়।

দলগত কাজ
মুক্ত দর্শনের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি দল তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

নতুন শিখলাম: কপিরাইট, কপিলেফট, ক্রিয়েটিভ কমন্স, ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, Pirated, ফেয়ার ইউজ, মুক্ত দর্শন।

পাঠ ২৪–২৬ : নৈতিকতা ও প্লেজারিজম

আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে যে দোকানগুলো আছে সেগুলো বাইরে থেকে দেখি, প্রত্যেকটা দোকানের দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখি না দরজাটা খোলা আছে কি না। যদি দরজাটা খোলাও থাকে আমরা অপরিচিত একজন মানুষের ঘরে ঢুকে যাই না। কেউ যদি ঢুকেও যায় সে দোকানের ভেতরের সব জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে চলে আসে না। সভ্য মানুষ হিসেবে আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব থাকে। বরং যদি কখনো দেখা যায় কেউ তার দরজা ভুলে খুলে চলে গেছে, তাকে ডেকে এনে বলি দরজাটা বন্ধ করে যেতে।

তথ্য প্রযুক্তি আসার পর হুবহু এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ইন্টারনেটে আমরা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখি, সেখানে যে মানুষ বা প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইট তৈরি করেছে তার যে অংশটুকু সে আমাদের দেখাতে চাইছে আমরা সেই অংশটুকু দেখতে পাই। ওয়েবসাইটের নিজস্ব বা গোপন অংশটুকুতে আমাদের ঢোকার কথা নয়, প্রয়োজনও নেই। সেখানে যেতে পারে তাদের নির্দিষ্ট মানুষজন– যারা গোপন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সেখানে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট তথ্য সাজিয়ে রাখে, বা কাজ করে। যাদের সেখানে যাবার অনুমতি নেই তারাও কিন্তু সেখানে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। পাসওয়ার্ড জানা না থাকলেও সেটাকে পাশ কাটিয়ে অনেক সময় কেউ ওয়েবসাইটের ভেতরে ঢুকে যায়। সেখানে ভেতরে ঢুকে সে কোনো কিছু স্পর্শ না করে বের হয়ে আসতে পারে– আবার কোনো কিছু পরিবর্তন করে বা নষ্ট করেও চলে আসতে পারে। যেহেতু এই কাজগুলো করা হয় নিজের ঘরে একটা কম্পিউটারের সামনে বসে এবং যেখানে অনুপ্রবেশ হয় সেটা হয়তো লক্ষ মাইল দূরের কোনো জায়গা– অদৃশ্য একটি সাইবার জগৎ, লোকচক্ষুর আড়ালে, তাই সেটা ধরার উপায়ও থাকে না। এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে হ্যাকিং এবং আজকাল নিয়মিতভাবে কম্পিউটারের ওয়েবসাইট হ্যাকিং হচ্ছে। কেউ যদি শুধু কৌতূহলী হয়ে অন্যের ওয়েবসাইটে ঢুকে কোনো ক্ষতি না করে বের হয়ে আসে তাকে বলে White hat hacker বা সাদা টুপি হ্যাকার আর যদি কোনো কিছু ক্ষতি করে আসে, নষ্ট করে বসে তখন তাকে বলে Black hat hacker বা কালো টুপি হ্যাকার। তোমরা শুনে অবাক হয়ে যাবে সাইবার ওয়ার্ল্ডে এরকম অসংখ্য সাদা টুপি আর কালো টুপি হ্যাকার প্রতিমুহূর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ওয়েবসাইটগুলোতে বেআইনিভাবে ঢোকা ততই কঠিন হয়ে যাচ্ছে– নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তেই আগের থেকে বাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে। তারপরও হ্যাকাররা বসে নেই। ১৯৮৩ সালে মাত্র ১৯ বছরের একটা ছেলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনীর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের নিরাপত্তা ভেদ করে তাদের ওয়েবসাইট হ্যাক করে ঢুকে গিয়েছিল।

বুঝতেই পারছ হ্যাকিং অনৈতিক কাজ। বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করতে বা বড় কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সবারই ইচ্ছে করে কিন্তু ওয়েবসাইটের হ্যাক করা সেরকম চ্যালেঞ্জ নয়। অনৈতিক চ্যালেঞ্জ নেয়ায় কোনো কৃতিত্ব নেই। যাদের বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ নেবার ইচ্ছে করে তাদের জন্যে শত শত সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ আছে, সেগুলোই নিতে পারে।

যখন এসএসসি, এইচএসসি বা সমমানের পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় তখন ওয়েবসাইটে সেটা দিয়ে দেয়া হয়। তোমাদের অনেকেই হয়তো লক্ষ করেছ প্রথম যখন সেটা প্রকাশিত হয়, আর সবাই একসাথে যখন সেটা দেখার চেষ্টা করে তখন অনেক সময়ই দেখা যায় ওয়েবসাইটটি কাজ করছে না। কেউ আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সেটা অস্বাভাবিক কিছু না– সবকিছুর একটা ধারণ ক্ষমতা থাকে, কাজেই ধারণ ক্ষমতার বেশি হয়ে গেলে ওয়েবসাইট আর সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। স্বাভাবিক

কারণেই সেটা হতে পারে। আবার অনেক সময় কেউ ইচ্ছে করে সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলতে পারে যেখানে একটা কম্পিউটারের একটা প্রোগ্রাম কৃত্রিমভাবে কোনো একটা ওয়েবসাইটে প্রতি সেকেন্ডে শত সহস্রবার প্রবেশ করতে পারে– তখন তার ধাক্কায় ওয়েবসাইটটি অচল হয়ে পড়ে। কাজেই এটাও অনৈতিক কাজ, ইচ্ছে করে একটা ওয়েবসাইট অচল করে দেয়ার মাঝে কোনো কৃতিত্ব নেই।

আজকাল অনেক পত্রপত্রিকাও ওয়েবসাইটে দেয়া হয়। অনেক পত্রপত্রিকাতেই একটা খবর বা কোনো একটা লেখার পিছনে পাঠকরা নিজেদের মন্তব্য লিখতে পারে। পাঠক ইচ্ছে করলেই অনেক সুচিন্তিতভাবে একটা খাঁটি মন্তব্য লিখতে পারে– কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় একজন পাঠক শুধু শুধু যুক্তিহীন, অশালীন একটা কথা লিখে রেখেছে। বিষয়টি নিয়ে কিছু করার নেই– কিন্তু সবাইকে জানতে হবে বিষয়টা অনৈতিক।

আজকাল দেশ-বিদেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাই ইন্টারনেটে থাকে। অনেক জায়গায় পাঠকরা সরাসরি মন্তব্য লিখতে পারে।

ইন্টারনেটে যেহেতু মানুষের নিজের মত প্রকাশের বিশাল স্বাধীনতা রয়েছে– যে কেউ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সেটা প্রকাশ করতে পারে। তাই মাঝে মাঝে সেটাকে অপব্যবহার করা হয়। ই-মেইলে অনেক সময় কাউকে আঘাত দিয়ে কিংবা হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দেয়া হয়। লুকিয়ে করা হয় বলে সেটা নিয়ে অনেক সময় কিছু করাও যায় না। কখনো কখনো দেখা যায় কোনো একজনকে অসম্মান করার জন্যে তার সম্পর্কে মিথ্যা কিংবা অসম্মানজনক কোনো তথ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়া হয়। অসংখ্য মানুষের কাছে তথ্য পাঠানোর যে কাজটি আগে কঠিন ছিল এখন সেটি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। কাজেই সেই কাজটি ভালোভাবে ব্যবহার না করে যখনই খারাপভাবে ব্যবহার করা হয় তখনই বুঝতে হবে নৈতিকতা রক্ষা করা হয়নি।

দলগত কাজ

হ্যাকিং করে কোনো একটি ওয়েবসাইট নষ্ট করে দিলে সেই ক্ষতিটুকু কোথা থেকে শুরু করে কোথায় পর্যন্ত যেতে পারে সেটি বের করো। তোমার বক্তব্যের পেছনে যুক্তি দেওয়ার জন্যে সম্ভাব্য হ্যাকিংয়ের একটা উদাহরণ দাও।

কখনো কখনো ইন্টারনেট বা তথ্য প্রযুক্তিতে শুধু যে অনৈতিক কাজ করা হয় তা কিন্তু নয়– সীমা অতিক্রম করে বেআইনি কাজও করার চেষ্টা করা হয়। ওয়েবসাইট হ্যাকিং করা শুধু যে অনৈতিক কাজ তা নয়, সেটা একই সাথে বেআইনি কাজ।

ইন্টারনেটে এরকম অনেক ধরনের মানুষ অনেক ধরনের অনৈতিক আর বেআইনি কাজ করে ফেলে।

আমাদের সেগুলো জানা থাকা ভালো। যেহেতু পুরো বিষয়টা হয় সাইবার জগতে, চোখের আড়ালে তাই প্রতারণার কাজটি হয় সবচেয়ে বেশি। যেমন হয়তো কারো সাথে যোগাযোগ করে বলা হলো যে সে লটারিতে অনেক টাকা পেয়েছে। টাকাটা নিতে হলে অমুক জায়গায় যোগাযোগ করতে হবে। সরল বিশ্বাসে হয়তো সেই মানুষটি যোগাযোগ করে। তখন তাকে বোঝানো হয় কিছু টাকা দিলে বড় পুরস্কারটা পেয়ে যাবে। অনেক সময় মানুষটি– সেই টাকা দিয়ে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যায়। আবার কেউ হয়তো জানায় যে, তার হাতে অনেক টাকা চলে এসেছে এবং সে টাকাটা নিরাপদে রাখতে চায়– তখন অনেকে লোভে পড়ে সেই ফাঁদে পা দেয়। কাজেই সবার জানা থাকা ভালো অপরিচিত ই-মেইলের এরকম অবিশ্বাস্য লোভনীয় আশ্বাস নিঃসন্দেহে প্রতারণা।

ইন্টারনেটের বড় একটি অপরাধ হয় ক্রেডিট কার্ড নিয়ে। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জেনে গেছ আজকাল কাগজের নোট দিয়ে টাকা-পয়সার লেনদেন খুব দ্রুত কমে আসছে। পৃথিবীর অনেকেই সেটি করে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। ইন্টারনেটে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হলে সেই কার্ডটিরও প্রয়োজন হয় না– শুধু নম্বরটি জানলেই চলে। কাজেই, মানুষের ক্রেডিট কার্ডের নম্বর জানার জন্য বড় বড় অপরাধীরা অনেক বড় বড় সাইবার অপরাধ করে। সাধারণত যখন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হয় তখন নিরাপত্তার বিষয়টিতে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়– সেখান থেকে নম্বরটি বের করা কঠিন। কিন্তু প্রতারকরা মানুষকে প্রতারণা করে ধোঁকা দিয়ে নম্বরটি জেনে নেবার চেষ্টা করে এবং মানুষটি বোঝার আগে সেই নম্বরটি ব্যবহার করে বড় অঙ্কের টাকা তুলে নেয়।

অনেক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে প্রতারকরা এ রকম ই-মেইল পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার চেষ্টা করে

আজকাল অপরাধীরাও ইন্টারনেটকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। তারা তাদের অবৈধ কাজের তথ্য ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে পাচার করে। সারা পৃথিবীতেই সেজন্য আইন পাস করা হচ্ছে। যাদের প্রচলিত আইনে বিচার করা যায় না তাদেরকে এই বিশেষ আইন দিয়ে বিচার করতে হয়।

পৃথিবীতে অনেক বিভ্রান্ত মানুষ থাকে যারা ভুল বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে। বাম বা ডান চরমপন্থী অনেক মানুষ বা দল আছে। তারা তাদের বিশ্বাসকে ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে প্রচার করার চেষ্টা করে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এমনও দেখা গেছে যে একটি সংগঠন হতাশ মানুষকে আরও হতাশ করিয়ে দিয়ে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তবে তোমাদের এসব নিয়ে আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। তোমাদের জানতে হবে তথ্য প্রযুক্তি, ইন্টারনেট কিংবা সাইবার জগৎ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। এটাকে ভুলভাবে ব্যবহার করে কিছু মানুষ হয়তো বড় ধরনের অন্যায় অপরাধ করে ফেলতে পারে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। আমরা যদি একটুখানি সতর্ক থাকি তাহলেই এই অপরাধী মানুষের পেতে রাখা ফাঁদে আমরা কখনোই পা দেব না। আমরা শুধু সুন্দর আর আমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ব্যবহার করতে পারব।

মেলিসা ভাইরাস তৈরি করার অপরাধে ডেভিড স্মিথ নামে এই মানুষটির দশ বছর জেল হয়েছিল

কম্পিউটার ভাইরাসের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। অনেকে মজা করার জন্য হোক বা অপরাধ করার জন্যেই হোক, নানা ধরনের কম্পিউটার ভাইরাস তৈরি করে সেটাকে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। সেগুলো ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে আমাদের ঘরের ভেতরে কম্পিউটারে ঢুকে পড়ে। ছোটখাটো যন্ত্রণা থেকে শুরু করে সেগুলো অনেক বড় বড় সমস্যা ঘটাতে পারে। Mydoom Worm নামে একটা কম্পিউটার ভাইরাস ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে একদিনে আড়াই লক্ষ কম্পিউটারকে আক্রান্ত করেছিল। ১৯৯৯ সালে Melissa নামে একটা কম্পিউটার ভাইরাস এত শক্তিশালীভাবে সাইবার জগৎকে আক্রমণ করেছিল যে, মাইক্রোসফটের মতো বড় কোম্পানিকে তাদের ই-মেইল সার্ভারকে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ভাইরাসের কারণে পৃথিবীতে কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

দলগত কাজ
কম্পিউটারে বেআইনি কাজ করে বিপদে পড়েছে এর উপর ভিত্তি করে একটা কার্টুন আঁকো।

প্লেজারিজম :
নিজের লেখায় অন্যের লেখা কোনো কিছু ব্যবহার করতে হলে সবসময় সেটি পরিষ্কার করে বলে অন্যের অবদান স্বীকার করতে হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. যার অন্তর্নিহিত মৌল সুর এক সুনির্দিষ্ট শিল্পাদর্শ ও শিল্পতাত্ত্বিক পটভূমির উপর স্থাপিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমসঞ্চারমান নাট্যবৃত্ত ও তাত্ত্বিকবোধে আমরা লক্ষ করি তাঁর স্বদেশ ও শিল্পভাবনার পরিণতিশীল এক অভিযাত্রা।

২. ড. আহমেদ আমীনুল ইসলাম, স্বদেশ ও শিল্পতত্ত্বের পটভূমিকায় নাট্যকার সেলিম আল দীন, থিয়েটার স্টাডিজ, সেলিম আল দীন সংখ্যা, জুন ২০০৮, সংখ্যা–১৫, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, পৃষ্ঠা–৬১।

৩. সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন কর্তৃক রচিত 'চাকা' নাটকের প্রচ্ছদভূমিকা।

৪. ড. আফসার আহমদ, সেলিম আল দীনের শিল্পতত্ত্ব ও বিশ্ববীক্ষা, থিয়েটার স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–২৬।

৫. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের উপকথা, রূপকথা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য জাগে... ১৯৮৬ সালে ঢাকা থিয়েটার আয়োজিত 'জাতীয় নাট্যমেলা'য় আমরা এদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সাধনের সংকল্প উচ্চারণ করি।

আমরা যখন লেখাপড়া করি তখন আমরা অনেক নতুন নতুন জিনিস শিখি যা আগে জানতাম না– তার সাথে সাথে আমরা আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখি, সেটা হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ হওয়া,খাঁটি মানুষ হওয়া। খাঁটি মানুষেরা অন্যায় করে না, অন্যায় সহ্যও করে না। নিজেরা অন্যায় করে না, অন্যদেরকেও অন্যায় করতে দেয় না। আমরা সব সময় স্বপ্ন দেখি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যখন লেখাপড়া করবে তখন অন্য অনেক নতুন জিনিস শেখার সাথে সাথে সত্যিকারের মানুষ হওয়াটাও শিখবে।

তারপরেও আমরা মাঝে মাঝে দেখি ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার সময় দেখাদেখি করে। তোমরা কখনো কখনো দেখে থাকবে বড় কোনো পরীক্ষার সময় কিছু ছাত্রছাত্রী নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ছে, তাদের পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে– এই ছাত্রছাত্রীরা নির্বুদ্ধিতা করে নিজেদের ভবিষ্যৎটাকেই নষ্ট করে ফেলছে।

এরকম ব্যাপার পৃথিবীর সব জায়গাতেই দেখা যায়– তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই বিষয়গুলো হঠাৎ করে নতুন একটা মাত্রা পেয়েছে। লেখাপড়া করতে গেলেই হোমওয়ার্ক করতে হয়। হোমওয়ার্কগুলো সব সময়েই নিজে করতে হয়। অন্য কেউ হোমওয়ার্ক করে দিলে হয়তো ভালো নম্বর পাওয়া যায় কিন্তু শেখা তো হয় না। হোমওয়ার্ক নানা ধরনের হতে পারে–ছাত্রছাত্রীরা যতই বড় ক্লাসে যায় ততই তাদেরকে আরো বড় বড় হোমওয়ার্ক করতে হয়। বড় রচনা লিখতে হয়, বড় প্রজেক্ট লিখতে হয়। যারা সত্যিকারের ছাত্র তারা নিজেরা পড়াশোনা করে খাটাখাটি করে গবেষণা করে সুন্দর সুন্দর রচনা লেখে। অনেক সময়েই কোনো কোনো শিক্ষার্থী সেই পরিশ্রম করতে রাজি হয় না। যেহেতু ইন্টারনেটে পৃথিবীর প্রায় সব বিষয়েই কিছু না কিছু তথ্য আছে তাই তারা সেখান থেকে হুবহু বিষয়টা নিয়ে নিজের নামে জমা দিয়ে দেয়। কিন্তু অন্যের লেখা চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া বা প্রকাশ করাকেই প্লেজিয়ারিজম বা লেখাচুরি বলে।

প্লেজারিজমের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ফরিদ জাকারিয়াকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

তোমরা সম্ভবত শব্দটা আগে শোননি, সত্যিকথা বলতে কী তোমরা যদি বড়দেরকে জিজ্ঞেস করো দেখবে তাদের অনেকেই এটা হয়তো আগে শোনেননি। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই শব্দটার সাথে পরিচিত হওয়া দরকার, কারণ এটা পৃথিবীতে বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুঝে হোক না বুঝে হোক অনেকেই প্লেজারিজম করছে– এবং তাদের অনেকেই এজন্য খুব বড় বিপদে পড়ে যায়।

আমরা অবশ্যই অন্যের লেখা পড়ে শিখব এবং নিজেরা কিছু লেখার সময় অন্যের লেখার সাহায্য নেওয়াটাও অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিলে নিজের লেখায় সেটা খুব পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হয়। কোন অংশটুকু তুমি নিজে লিখেছ আর কোন অংশটা অন্যের লেখা থেকে নিয়েছ সেগুলো যদি খুব স্পষ্ট থাকে তাহলেই কোনো সমস্যা হয় না।

তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্লেজারিজম যেমন বেড়েছে ঠিক সেরকম প্লেজারিজম ধরার কৌশলও অনেক বেড়েছে। তোমরা কি জানো কোনো মানুষ যদি ইন্টারনেটের কোনো জায়গা থেকে কোনো কিছু হুবহু টুকে নেয় সেটা কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে সাথে সাথে খুঁজে বের করা যায়?

অন্যায় করলে সেটা নিজের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে– কিন্তু নিজের জন্য বিপজ্জনক সেজন্য নয়, তোমরা কখনোই কোনো অন্যায় করবে না। কারণ তোমরা বাংলাদেশের একেবারে খাঁটি মানুষ হয়ে বড় হবে এবং বড় হয়ে তোমরাই একদিন এই দেশের দায়িত্ব নেবে।

দলগত কাজ : ক্লাসের সবাই দুটি দলে ভাগ হয়ে প্লেজারিজম আর নিজের তৈরি করা কাজের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

নতুন শিখলাম: হ্যাকিং, কালো টুপি হ্যাকার, সাদা টুপি হ্যাকার, ক্রেডিট কার্ড, Mydoom Worm, Melissa, প্লেজারিজম।

নমুনা প্রশ্ন

১. বাড়িতে কম্পিউটার রাখার সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান কোনটি?

ক. বসার ঘর খ. শোয়ার ঘর

গ. খাবার ঘর ঘ. পড়ার ঘর

২. সামাজিক নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে–

i. ব্যক্তির সাথে সরাসরি যোগাযোগ নাও হতে পারে

ii. আন্তরিকতার অভাব থাকে

iii. প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. কম্পিউটারে আসক্ত একজন ব্যক্তি–

ক. অসামাজিক হয়ে যেতে পারে খ. কম্পিউটারে দক্ষ হতে পারে

গ. লেখাপড়ায় ভালো হতে পারে ঘ. জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতি করতে পারে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রিমুর বয়স পাঁচ। ইদানীং ঘুম থেকে উঠেই সে টেলিভিশনে কার্টুন দেখতে শুরু করে। এ সময় সে বাবা-মাকে বিরক্ত করে না বলে বাবা-মাও বেশ খুশি।

৪. রিমুর ক্ষেত্রে কার্টুন দেখাকে বলা যায়–

ক. সময় কাটানো খ. প্রয়োজন মেটানো

গ. কার্টুনের প্রতি আসক্তি ঘ. আনন্দ উপভোগ করা

৫. রিমুর প্রতি বাবা-মার আচরণে সে–

i. অসামাজিক হয়ে উঠতে পারে

ii. শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে বেড়ে উঠতে পারে

iii. সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়ার্ড প্রসেসিং

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

১. সঠিক পরিভাষা ব্যবহার করে ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. বাংলা কী–বোর্ড ব্যবহারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব;
৩. ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারব;
৪. ওয়ার্ডে বাংলা ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারব;
৫. সুষ্ঠুভাবে ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা করতে পারব।

পাঠ ২৭ থেকে ৫৪ : ওয়ার্ড প্রসেসিং ও বাংলা কীবোর্ডের ব্যবহার

তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ, আমরা এখন লেখালেখি, ছবি আঁকাসহ অনেক কাজই করতে পারি কম্পিউটার ব্যবহার করে। ওয়ার্ড প্রসেসিং ব্যবহার করে তোমরা এর মধ্যেই ইংরেজিতে ডকুমেন্ট টাইপ করতে শিখেছ। এখন এ শ্রেণিতে আমরা শিখব ওয়ার্ড প্রসেসিং ব্যবহার করে বাংলা ডকুমেন্ট তৈরি করার কলাকৌশল।

মুনীর ইউনিকোড কীবোর্ড লে-আউট

বাংলা কীবোর্ড: ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে কোনো কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন একটি কীবোর্ডের। কীবোর্ড হলো ওয়ার্ড প্রসেসরের প্রধান ইনপুট ডিভাইস। ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ে বাংলায় লেখালেখি করতে হলে আমাদের বাংলা কীবোর্ড সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। ইংরেজি কীবোর্ডের উপর ভিত্তি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ রাইটারের জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত কীবোর্ড লে-আউট তৈরি করেন।

পরবর্তী সময়ে এ কীবোর্ড লে-আউটই কম্পিউটারের জন্য করা হয়। কিন্তু প্রয়োজন হয় এমন একটি সফটওয়্যারের যা কম্পিউটারে বাংলা লিখতে সহায়তা করবে। এ পর্যায়ে ১৯৮৫ সালে কিছু বাংলা ফন্টসহ শহীদ লিপি সফটওয়্যারটি প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এটি তেমন একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে নব্বই দশকের শেষের দিক পর্যন্ত অনেকগুলো বাংলা লেখার সফটওয়্যার বাজারে আসে। যার মধ্যে বিজয়, প্রশিকা শব্দ, প্রবর্তনা, লেখনী প্রভৃতি প্রথম সারিতে ছিল সফটওয়্যার উন্নয়নের কারণে এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় বিজয় সফটওয়্যারটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সময় বিভিন্ন কীবোর্ড লে-আউট প্রচলিত হলেও বিজয় কীবোর্ড লে-আউট সবচেয়ে এগিয়ে থাকে।

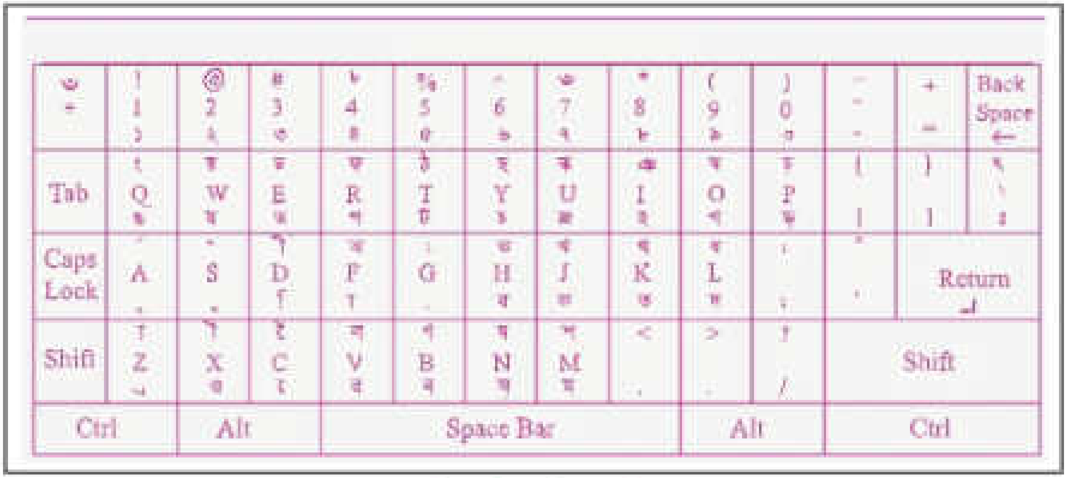

বিজয় কীবোর্ড লে-আউট

ওয়ার্ড প্রসেসরে বিজয় কীবোর্ড সচল করতে Ctrl+Alt+B একসাথে চাপতে হবে। বিজয় কীবোর্ডে যেকোনো দুটি অক্ষরকে যুক্ত করতে হলে প্রথম অক্ষরটি চেপে ইংরেজি জি (g) চাপতে হবে। তারপর দ্বিতীয় অক্ষরটি চাপতে হবে।

বিশেষ যুক্তাক্ষর:

বর্ণ	কী	বর্ণ	কী	বর্ণ	কী	বর্ণ	কী
ক্ষ	jgN	ষ্ণ	NgB	ঞ্চ	Igy	জ্ঞ	ugI
ঞ্জ	Igu	ঞ্ছ	IgY	ঙ্গ	qgo		

যদিও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC) ন্যাশনাল কীবোর্ড নামে একটা বাংলা কীবোর্ড লে-আউট অনুমোদন করেছে কিন্তু তার ব্যবহার এখনো শুরু হয়নি। পৃথিবীর অন্য সকল ভাষার মতো বাংলাও ইউনিকোড

উচ্চারণভিত্তিক (ফোনেটিক) কীসমূহ

ব্যবহার করে লেখা যায়। কাজেই একজন যে কীবোর্ড ব্যবহার করেই বাংলা লিখুক না কেন, সেটি সংরক্ষণ

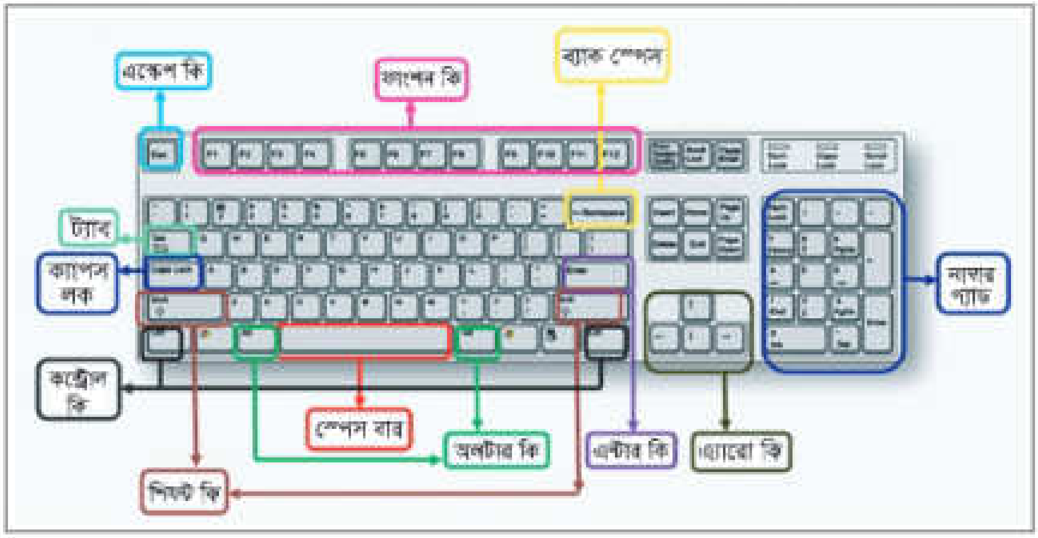

কীবোর্ডের বিশেষ কীসমূহ

করা হবে আন্তর্জাতিক নিয়মে সে কারণে একটি নির্দিষ্ট কীবোর্ডের গুরুত্ব কমে এসেছে। এদিকে ২০০০ সালের পর থেকে বাড়তে থাকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা। প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বাংলায় ওয়েব পেইজ তৈরি করার। ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তার কারণে প্রয়োজন হয় এমন একটি সফটওয়্যারের যা ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলা লেখার সুবিধা এনে দিবে। ২০০৭ সালে মেহেদী হাসান খান কর্তৃক বিনামূল্যের ইউনিকোড সফটওয়্যার অভ্র প্রবর্তিত হয়। এটির উচ্চারণভিত্তিক (ফোনেটিক) বাংলা টাইপিং ব্যবস্থা। এটিকে তরুণ সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় করে তোলে।

উচ্চারণভিত্তিক (ফোনেটিক) বাংলা টাইপিং ব্যবস্থায় যদি "**ami banglay gan gai**" টাইপ করা হয় তবে লেখা হবে 'আমি বাংলায় গান গাই'। এছাড়া এতে যুক্ত করা হয় মাউস দিয়ে বাংলা লেখার সুবিধা। ফলে কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহারে যাদের ভীতি ছিল তারা সহজেই বাংলা ব্যবহার করতে শুরু করে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সফটওয়্যারেই শহীদ মুনীর চৌধুরীর উদ্ভাবিত মুনীর অপটিমা কীবোর্ড লে-আউটটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মেহেদী হাসান খান

ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম কীভাবে চালু করতে হয় মনে আছে?

প্রথমে আমাদেরকে যেকোনো একটি ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। এরপর বাংলায় টাইপ করার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসরকে প্রস্তুত করতে হবে। বাংলায় লেখালেখি করার জন্য প্রথমে আমাদের ওয়ার্ড প্রসেসরে বিজয় সফটওয়্যারে Ctrl+Alt+b একসাথে চাপতে হবে এবং অভ্র সফটওয়্যারে F12 কী চাপতে হবে। পরবর্তী কাজ হলো ফন্ট নির্বাচন করা। বিজয় সফটওয়্যারে SutonnyMJ এবং অভ্র সফটওয়্যারে Nikosh বা যেকোনো ইউনিকোড ফন্ট নির্বাচন করতে হবে। এবার আমাদের কম্পিউটারের ওয়ার্ড প্রসেসর

বাংলা লেখালেখি করার জন্য প্রস্তুত। কীবোর্ডের বিভিন্ন কী চেপে দেখো কোথায় কোন অক্ষর আছে। অক্ষরগুলোর অবস্থান জানতে তোমরা উপরে দেখানো কীবোর্ড লেআউট এর ছবির সাহায্য নিতে পারো। এবার লেখালেখি শুরু করার পালা। কীবোর্ডের বিভিন্ন কী চেপে দেখো কোন অক্ষরটি কোথায় আছে। ধীরে ধীরে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে অক্ষরগুলোর অবস্থান।

যেকোনো ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করার সময় তা যেন হারিয়ে না যায় সেজন্য কী করতে হবে মনে আছে তো? ডকুমেন্টটিকে একটি নাম দিয়ে সংরক্ষণ বা সেইভ করতে হবে।

দলগত কাজ

অক্ষরগুলোর অবস্থান সম্পর্কে একটু ধারণা হলে চলো আমরা নিচের কাজটি করি :
আমাদের সকলের প্রিয় জাতীয় সংগীতের প্রথম লাইনটি টাইপ করো।

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি

ডকুমেন্ট সম্পাদনা

আশা করি তোমরা সবাই এখন বাংলায় লেখালেখি করতে পারছো। ভুল-ভ্রান্তি থাকছে? থাকতেই পারে। কীভাবে আমরা ভুল-ভ্রান্তিগুলো দূর করব ?

যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে একটি ডকুমেন্টের ভুল-ভ্রান্তিগুলো ঠিক করা হয় সে কাজটিকে বলা হয় সম্পাদনা (Editing)। সম্পাদনায় সাধারণত যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

নির্বাচন করা (Select): সম্পাদনার বিভিন্ন কাজে অনেক সময়ই ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে নির্বাচন করতে হয়। নির্বাচন করার জন্য কার্সরকে নির্ধারিত জায়গার শুরুতে নিতে হবে। এরপর শিফট কী চেপে ধরে ডান এ্যারো (Shift +→) কী চেপে নির্ধারিত কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে নির্বাচন করতে হয়।

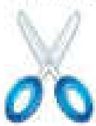

কাট (Cut): অনেক সময় ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাতে হয়। এজন্য প্রথমে ঐ অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা অংশকে নির্বাচন করে কাটার জন্য কীবোর্ডের Ctrl এবং x কী (Ctr + x) একসাথে চাপতে হয়।

কপি (Copy): অনেক সময় ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশের অনুলিপি বা কপি করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হয়। এজন্য প্রথমে ঐ অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা অংশকে নির্বাচন করে কী-বোর্ডের Ctrl এবং c কী (Ctr + c) একসাথে চাপতে হয়।

পেস্ট (Paste): পেস্ট শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল আঠা লাগানো। কাট ও কপি করার পরের কাজ হল নির্বাচিত অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা অংশকে নির্ধারিত স্থানে পেস্ট করা। এজন্য কাট বা কপি কমান্ড ব্যবহার করার পর কার্সরকে নির্ধারিত স্থানে নিয়ে Ctrl এবং v কী (Ctr + v) একসাথে চাপতে হবে।

ডিলিট (Delete) বা মুছে ফেলা: ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে মুছে ফেলতে হলে কীবোর্ডের Delete বা Del কী ব্যবহার করা হয়। যা মুছে ফেলতে চাই প্রথমে

তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর Delete বা Del বা BACKSPACE কী চাপলে নির্বাচিত অংশ মুছে যাবে।

কীবোর্ডের সাহায্যে ডকুমেন্টের বিভিন্ন জায়গায় কার্সরকে সরাতে হলে নিচের সংক্ষিপ্ত উপায় অনুসরণ করা যেতে পারে:

যা করতে চাই	যে কী চাপতে হবে
লাইনের শুরুতে কার্সর নিতে	HOME
লাইনের শেষে কার্সর নিতে	END
ডকুমেন্টের শুরুতে কার্সর নিতে	CTRL + HOME
ডকুমেন্টের শেষে কার্সর নিতে	CTRL + END

ডকুমেন্ট ফরম্যাট করা

ডকুমেন্ট তৈরি করা হলো, সম্পাদনা করা হলো। এখন ডকুমেন্টকে একটু সাজাতে হবে। যাতে করে ডকুমেন্টটি দেখতে সুন্দর হয়। এ কাজটাকে বলে ডকুমেন্ট ফরম্যাটিং।

আমরা অনেকভাবে ডকুমেন্টকে সাজাতে পারি। আমাদের আলোচনা কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ রাখব। কাজ করতে করতে তোমরা হয়তো আরো অনেক কিছু জানতে পারবে।

অক্ষর বা লেখা আকার ছোট বা বড় করা: ডকুমেন্টের যে অংশের অক্ষর বা লেখার আকার পরিবর্তন করতে হবে প্রথমে তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর যেকোনো ওয়ার্ড প্রসেসরে টুলবার বা রিবনে ফন্টের নামের পাশে যে সংখ্যাটি থাকে তা পরিবর্তন করতে হবে। আকার বড় করতে হলে সংখ্যাটি বাড়াতে হবে এবং ছোট করতে হলে সংখ্যাটি কমাতে হবে। কীবোর্ডের সাহায্যেও কাজটি সহজে করা যায়।

যা করতে চাই	যে কী ব্যবহার করতে হবে
লেখার আকার ১ পয়েন্ট বড় করতে	CTRL +]
লেখার আকার ১ পয়েন্ট ছোট করতে	CTRL + [

অক্ষর বা লেখার আকার বোল্ড, ইটালিক বা আন্ডারলাইন করা: ডকুমেন্টের যে অংশের অক্ষর বা লেখার আকার পরিবর্তন করতে হবে প্রথমে তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর যেকোনো ওয়ার্ড প্রসেসরে টুলবার বা রিবনে ফন্টের নামের পাশে B, I, U থাকে তাতে মাউস ক্লিক করতে হবে। কীবোর্ডের সাহায্যেও কাজটি সহজে করা যায়।

যা করতে চাই	যে কী ব্যবহার করতে হবে
লেখা বোল্ড করতে	CTRL + b
লেখা ইটালিক করতে	CTRL + i
লেখা আন্ডারলাইন করতে	CTRL + u

ডকুমেন্টের এলাইনমেন্ট: কোনো ডকুমেন্টের প্যারাগ্রাফ মার্জিনের কোনদিকে মিশে থাকবে তা এলাইনমেন্টের দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত প্যারাগ্রাফের এলাইনমেন্ট বামদিকে থাকে। প্যারাগ্রাফের এলাইনমেন্ট চার ধরনের হতে পারে। বামদিক থেকে, ডানদিক থেকে, মাঝ বরাবর অথবা সবদিকে সমান (জাস্টিফাইড) প্যারাগ্রাফ এলাইন করা যায়। কোনো প্যারাগ্রাফের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন করতে হলে প্রথমে তা নির্বাচন করতে হয়। তারপর এই আইকনগুলোতে মাউস ক্লিকের মাধ্যমে এলাইনমেন্ট করা হয়।

২০২৫

কী-বোর্ড শর্টকাট

যা করতে চাই	যে কী ব্যবহার করতে হবে
বামদিকে এলাইন	CTRL + l
ডানদিকে এলাইন	CTRL + r
মাঝখানে এলাইন	CTRL + e
জাস্টিফাইড এলাইন	CTRL + j

এছাড়া ফরম্যাটিংয়ের আরও অনেক কাজ আছে। যেমন–লাইনের ব্যবধান নির্ধারণ (লাইন স্পেস), টেবিল করা, বুলেট ও নাম্বার, লেখার রং পরিবর্তন ইত্যাদি। ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার ব্যবহার করতে করতে তোমরা এ বিষয়গুলো আয়ত্বও করতে পারবে।

মুদ্রণ

কী মজা! আমরা এখন ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে বাংলায় ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারি। কেমন হয় যদি এটা আমরা কাগজে ছাপাতে পারি। চল শিখে নেয়া যাক কীভাবে কোন ডকুমেন্ট ছাপানো যায় বা মুদ্রণ করা যায়।

মুদ্রণের জন্য প্রয়োজন

- কম্পিউটারের সাথে যথাযথভাবে সংযুক্ত একটি প্রিন্টার
- প্রিন্টারের জন্য দরকারি সফটওয়্যার
- উপযুক্ত সাইজের কাগজ

সব ঠিক আছে? তাহলে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে (Print) আইকনে মাউস ক্লিক কর (এ কাজটি কী-বোর্ডের সাহায্যে CTRL + p চেপে করতে পারো)। এরপর ↵ (এন্টার) কী চাপলে শুরু হবে মুদ্রণের কাজ।

ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা

ওয়ার্ড প্রসেসরে বাংলায় ডকুমেন্ট তৈরি করা কত সহজ এর পরের কাজ কী? ডকুমেন্টটি এমনভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে এটি হারিয়ে না যায় এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। এ কাজটিকে সহজভাবে ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা বলে।

সাধারণভাবে যেকোনো ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করলে সেটি মাই ডকুমেন্ট ফোল্ডারে সংরক্ষিত (Save) হয়। কিন্তু সেখানে অনেক ফাইলের মাঝে তোমার করা ডকুমেন্টটি মিশে থাকবে। প্রয়োজনের সময় ডকুমেন্টটি পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। এজন্য যে কাজগুলো করতে হবে তা নিচে বর্ণনা করা হলো :

ক. মাই ডকুমেন্ট ফোল্ডার খুলে তার মধ্যে একটি নতুন ফোল্ডার খুলতে হবে।

খ. প্রাথমিকভাবে ফোল্ডারটির নাম নিউ ফোল্ডার লেখা থাকবে। এটিকে নিজের মতো করে নামকরণ করতে হবে। নিজের নাম অথবা তারিখ অনুযায়ী ফোল্ডারের নামকরণ করতে পারো ।

গ. তোমার তৈরি করা ডকুমেন্টটি সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটারকে নির্দেশ দিলে যে ডায়ালগ বক্স আসবে সেখানে তোমার ফোল্ডারটি মাউসের ডাবল ক্লিক করার মাধ্যমে খুলে তারপর সংরক্ষণ করো।

ঘ. ডকুমেন্ট সংরক্ষণের সময় কাজের ধরন অনুযায়ী ডকুমেন্টের নামকরণ করো। এতে ডকুমেন্টটি সহজেই খুঁজে বের করতে পারবে।

দলগত কাজ

ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

নতুন শিখলাম : কীবোর্ড লে-আউট,ডকুমেন্ট ফরম্যাটিং, কাট, কপি, পেস্ট, কী-বোর্ড শর্টকাট, প্রিন্টিং বা মুদ্রণ।

নমুনা প্রশ্ন

১. কম্পিউটারে লেখালেখির কাজ করার সফটওয়্যার কোনটি?

ক. গ্রাফিক্স সফটওয়্যার　　খ. সিস্টেম সফটওয়্যার

গ. ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার　　ঘ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার

২. উচ্চারণভিত্তিক বাংলা সফটওয়্যার কোনটি?

ক. বিজ্ঞান　　খ. প্রবর্তন

গ. লেখনী　　ঘ. অভ্র

৩. 'এন্টার' (Enter) কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

ক. নির্বাচিত অংশ মুছে ফেলতে　　খ. কার্সরকে এক লাইন নিচে নামাতে

গ. কার্সরের বামদিকের অক্ষর মুছতে　　ঘ. মেনু বা ডায়ালগ বক্স বাতিল করতে

৪. কোনো কিছু কপি করতে কোথায় ক্লিক করতে হবে?

ক. 　　খ. 　　গ. 　　ঘ. 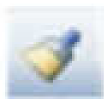

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রানুর জন্ম আমেরিকায়। সে বাংলায় কথা বলতে পারলেও লিখতে পারে না। সে ঠিক করেছে ঈদে দাদুকে বাংলায় লিখে চমৎকার একটি কার্ড পাঠিয়ে চমকে দেবে।

৫. রানু কার্ড বানাতে কোন সফটওয়্যারটি ব্যবহার করবে?

ক. বিজয়　　খ. লেখনী　　গ. প্রশিক্ষণ　　ঘ. অভ্র

৬. রানু কার্ডটি সুন্দর ও সহজে তৈরি করতে–

i. কিছু শব্দ কপি করতে পারে

ii. ছবি সংযুক্ত করতে পারে

iii. এডিটিং করে বানান শুদ্ধ করতে পারে

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

১. শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;

২. শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারব;

৩. ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট (পাঠ্য বিষয়ের) তথ্য অনুসন্ধান করতে পারব।

পাঠ ৫৫ : শিক্ষায় ইন্টারনেট

ঘটনা ১: জারা তার বাংলা বইটি হারিয়ে ফেলেছে– বইটি মোটেও হারানোর ইচ্ছে তার ছিল না– কিন্তু সেটি সত্যি হারিয়ে গেছে। স্কুল লাইব্রেরি থেকে তার প্রিয় গল্পের বইগুলো আনার সময় হাতে অনেকগুলো বই হয়ে গিয়েছিল তখন, কোনো এক ফাঁকে বাংলা বইটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছে, সে টেরও পায়নি। বাসায় এসে তার ভারি মন খারাপ– সুন্দর বাংলা বইটা তার খুব প্রিয় বই ছিল। শুধু তাই নয় কয়েকদিন পর পরীক্ষা, সে বই ছাড়া কেমন করে পড়বে?

এই বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করলেন তার বাবা– তিনি জানেন NCTB (National Curriculum and Textbook Board)–এর ওয়েবসাইটে সব পাঠ্যপুস্তক রেখে দেয়া আছে, যে কেউ সেখান থেকে বই ডাউনলোড করে নিতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রিন্টারে প্রিন্ট করে সেটাকে বাঁধিয়ে নিলে সেটা পুরোপুরি সত্যিকারের পাঠ্যপুস্তকের মতো হয়ে যায়। তাই কয়েক ঘন্টার মধ্যে জারা তার প্রিয় বাংলা বইটি পেয়ে গেল।

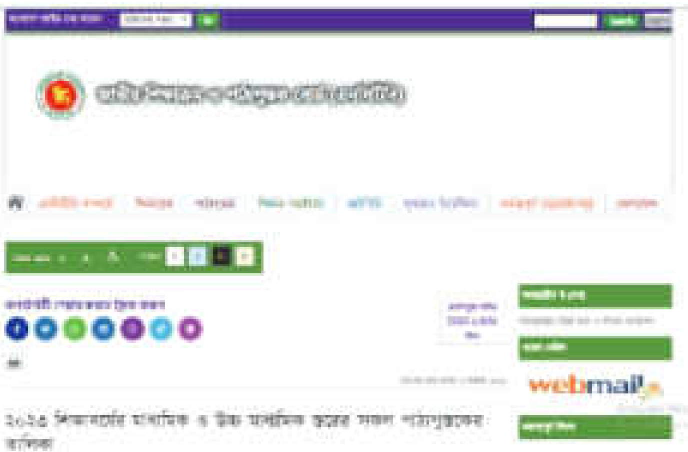

এনসিটিবির ওয়েবসাইট (www.nctb.gov.bd) থেকে যেকোনো পাঠ্যবই ডাউনলোড করা যায়

ঘটনা ২: আকাশ তার বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছে প্লুটো নাকি আর গ্রহ নয়, শুনে সে বেশ অবাক হলো। সেই ছোটবেলা থেকে সে শুনে এসেছে প্লুটো সৌরজগতের একটা গ্রহ– হঠাৎ করে সেটাকে গ্রহের তালিকা থেকে কেন সরিয়ে দেয়া হলো কে জানে? সে তার বাসায় বড় ভাইকে, বাবা–মাকে জিজ্ঞেস করল, কেউ ঠিক করে বলতে পারল না। স্কুলে স্যারকে জিজ্ঞেস করেও সে ঠিক উত্তরটি জানতে পারল না– ঠিক তখন তার ইন্টারনেটের কথা মনে পড়ল। সে ইন্টারনেটে প্লুটো গ্রহ নিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই উত্তরটি জেনে গেল– ভাগ্যিস তার ইন্টারনেটের কথা মনে পড়েছিল।

ঘটনা ৩: প্রিয়াংকা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করছে, কিন্তু হঠাৎ সে একটা জায়গায় আটকে গিয়েছে, একটা বিশেষ ফাংশন সে কিছুতেই ঠিক করে ব্যবহার করতে পারছে না। তাকে একটা বড় হোমওয়ার্ক জমা দিতে হবে– এই বিশেষ ফাংশনটি কেমন করে ব্যবহার করা হয়, না জানলে সে তার হোমওয়ার্কটি জমা দিতে পারবে না। ইন্টারনেটে সে এটা সম্পর্কে অনেক খুঁজেছে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

প্রিয়াংকা হতাশ হলো না, কম্পিউটার ল্যাংগুয়েজ ফোরামে সে এই প্রশ্নটা করে রাখল। এক ঘন্টার ভেতরে সে আবিষ্কার করল পাঁচজন প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে রেখেছে– একজনের উত্তরটা হুবহু তার প্রশ্নের উত্তর। প্রিয়াংকার আনন্দ দেখে কে– এবারে নতুন উৎসাহ নিয়ে তার কাজ শুরু করে দেয়।

ঘটনা ৪: রতন ইংরেজি পরীক্ষা দেবে– সে বেশ অনেকদিন থেকে ইংরেজি পড়ে আসছে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না তার পড়াশোনা যথেষ্ট হয়েছে নাকি আরো দরকার। কী করবে সেটা নিয়ে তার বন্ধুর সাথে কথা বলছিল। বন্ধু বলল, "তুই অন লাইনে একবার পরীক্ষা দিয়ে দেখিস না কেন কেমন শিখেছিস!" রতন জিজ্ঞেস করল, "অনলাইনে পরীক্ষা দেয়া যায়?" বন্ধু বলল, "অবশ্যই!"

রতন ইন্টারনেটে ঢুকে অনলাইন পরীক্ষার একটা ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখল সত্যি সেখানে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে– খুব উৎসাহ নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে সে আবিষ্কার করল তার প্রস্তুতি বেশ ভালো। অনলাইন পরীক্ষায় বাড়তি সুবিধাটাও সে আবিষ্কার করল– যে প্রশ্নগুলোর ভুল উত্তর দিয়েছে সেগুলোর শুদ্ধ উত্তর কী হবে সেটাও সে জেনে নিল।

ঘটনা ৫: শুক্লা ইউনিভার্সিটিতে ফাইবার অপটিক্স পড়ায়। তার যেহেতু বয়স কম তাই তার অভিজ্ঞতাও কম– সব সময় মনে মনে ভাবে আমার যদি কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাথে পরিচয় থাকত তাহলে তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারতাম কেমন করে এই কোর্সটা আরো ভালো করে পড়ানো যায়।

একদিন ইন্টারনেটে একটা খুব বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে খোঁজাখুঁজি করতে করতে সে আবিষ্কার করল তার বিষয় ফাইবার অপটিক্সের পুরো কোর্সের লেকচার নোট সেখানে রয়েছে– একজন অনেক বড় প্রফেসর কোর্সটি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছেন।

শুক্লা সাথে সাথে কোর্সগুলো ডাউনলোড করে তার নিজের লেকচারটা নতুন করে সাজিয়ে নিল, পরদিন সে ক্লাস নিতে গেল অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

ঘটনা ৬: রাজীব পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পাশ করেছে কিন্তু তার খুব দুঃখ তার বিশ্ববিদ্যালয়ে এস্ট্রোফিজিক্সের উপর কোনো কোর্স ছিল না– তার খুব শখ এই বিষয়টা পড়ার। হঠাৎ করে খবর পেল খুব বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বড় প্রফেসর এস্ট্রোফিজিক্সের উপর অন লাইনে একটা কোর্স দিচ্ছেন। তার ছাত্র হয়ে সে অনলাইনে পুরো কোর্সটি নিতে পারবে– হোমওয়ার্ক জমা দিতে পারবে, এমনকি পরীক্ষাও দিতে পারবে।

রাজীবের আনন্দ দেখে কে– সাথে সাথেই সে কোর্সটিতে রেজিস্ট্রেশন করে মনের আনন্দে এস্ট্রোফিজিক্স পড়তে শুরু করে।

উপরের ৬টি ঘটনার প্রত্যেকটি সত্যি, শিক্ষায় সত্যি ইন্টারনেটের ব্যবহার করা যায় কি না সেটা নিয়ে কারো মনে এখনো সন্দেহ আছে?

দলগত কাজ

বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর যদি একটি করে ল্যাপটপ থাকত তখন শিক্ষার ব্যাপারে আর কী কী করা যেতে পারে সেটি নিয়ে সবাই মিলে একটি রচনা লেখো।

নতুন শিখলাম: এস্ট্রোফিজিক্স, ফাইবার অপটিক্স, প্লুটো।

পাঠ ৫৬ : শিক্ষায় ইন্টারনেট

তোমরা যারা আগের পাঠটি মন দিয়ে পড়েছ তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ শিক্ষায় যেসব বিষয় সবচেয়ে সাহায্য করতে পারে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট শুধু যে সরাসরি শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করে তা নয়– স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন ঠিকমতো কাজ করতে পারে সেখানেও পরোক্ষভাবে শিক্ষার কাজে সাহায্য করে।

যেমন তোমরা সবাই জানো পরীক্ষার ফলাফলগুলো আজকাল তোমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে

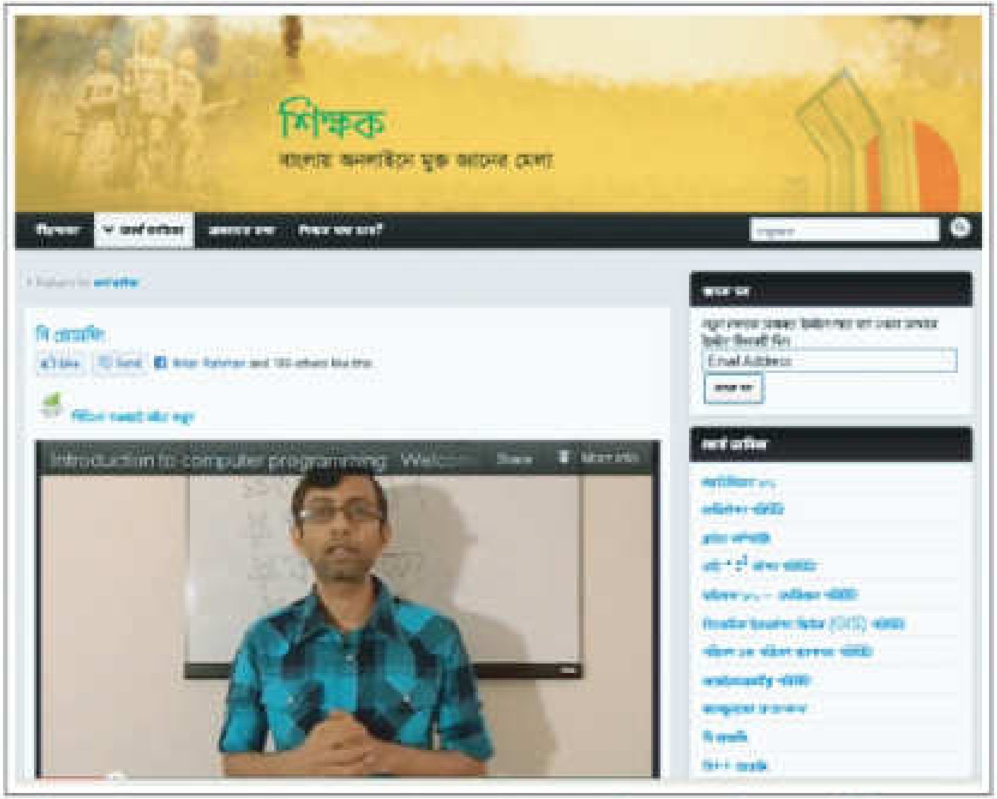

শিক্ষক ডট কম (http://shikkhok.com) ওয়েবসাইটে অনেক শিক্ষক নানা বিষয়ে কোর্স পড়িয়ে থাকেন

জানতে পার। কিছুদিন আগেও যেটি ছিল অনেক কঠিন। গ্রামে বা প্রত্যন্ত এলাকায় যারা ছিল পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য তাদের অনেক পথ পাড়ি দিয়ে শহরে আসতে হতো– আজকাল মোবাইল টেলিফোনের একটি মেসেজ বা ইন্টারনেটে এক ক্লিকেই পরীক্ষার ফলাফল জেনে নেওয়া যায়।

পরীক্ষার ফলাফল জানার ব্যাপারে ইন্টারনেট যেরকম অনেক বড় ভূমিকা রাখে– স্কুল–কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারেও ইন্টারনেট অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। তোমরা মোবাইল টেলিফোন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি রেজিস্ট্রেশনের কথা শুনেছ– ঠিক সেরকম ইন্টারনেট ব্যবহার করেও লক্ষ লক্ষ

২০১৮

ছেলেমেয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে দেয়া হয়। আমাদের দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চার লক্ষ শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা দেয়– তোমরা কি জানো এই চার লক্ষ পরীক্ষার্থী সবাই ভর্তির জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনকারী প্রায় চার লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রক্রিয়া করা হয়েছিল

একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার আগে সবাই সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটু তথ্য জানতে চায়। আগে সেই তথ্য জানার জন্য একজন মানুষকে অনেক দূর থেকে সেখানে আসতে হতো– এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য একজন ঘরে বসে জেনে নিতে পারে।

প্রযুক্তির কারণে ইতোমধ্যে আমরা অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করছি– কিছুদিনের ভেতরে আমাদের দেশেই আমরা আরও নানা ধরনের নতুন নতুন সুযোগ পেতে যাচ্ছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম তৈরি হতে যাচ্ছে যেটি সারা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক যখন পড়াবেন তখন সেটি শুধু তার ক্লাসরুমে আসা অল্প কয়জন ছাত্রছাত্রী তার সামনে বসে সেটি শুনবে না– ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে বসে হয়তো সারা দেশের অনেক ছাত্রছাত্রী সেটা শুনবে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অনেক দূর থেকে হয়তো একটা জটিল অপারেশন নিজের চোখে দেখতে পারবে। দূর পাহাড়ের উপর বসানো একটা টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে একজন শিক্ষার্থী সৌরজগতের কোনো গ্রহ বা দূর গ্যালাক্সির কোনো নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। অনেক আধুনিক একটা ল্যাবরেটরির কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট একটা ছাত্র তার ঘরে বসে করে ফেলতে পারবে। স্কুল লাইব্রেরিতে যে বইটি নেই মুহূর্তের মধ্যে সেই বইটিও একজন শিক্ষার্থী পড়ার জন্য নিয়ে আসতে পারবে।

সবকিছু দেখে-শুনে মনে হয় যখন ইন্টারনেট ছিল না তখন মানুষ কেমন করে লেখাপড়া করত?

দলগত কাজ

আজ থেকে একশ বছর পরে শিক্ষার ব্যাপারে তথ্য প্রযুক্তি কী ভূমিকা রাখতে পারে সেটি কল্পনা করে একটি দেয়াল পত্রিকা বের করো।

নতুন শিখলাম: ভার্চুয়াল ক্লাসরুম, টেলিস্কোপ, গ্যালাক্সি।

পাঠ ৫৭-৭০: ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুসন্ধান

ইন্টারনেটে শিক্ষাবিষয়ক তথ্য

ইন্টারনেট তথ্যের এক বিশাল ভান্ডার। দুনিয়ার এমন কোনো বিষয় নেই যা সম্পর্কে ইন্টারনেটে কোনো তথ্য নেই। শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রায় সব বিষয়েই ইন্টারনেটে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে রয়েছে নানান তথ্য। শিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার ধরন এবং শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য ইন্টারনেটে খুঁজলে পাওয়া যায়।

ইন্টারনেটে এ সকল তথ্য সাধারণত কয়েকভাবে থাকতে পারে। একটি হলো লিখিত তথ্য। এই ধরনের তথ্যেরও রকমফের থাকে। কোনোটি হয় সরাসরি তথ্য। যেমন– নিউটনের গতির সূত্রাবলি। আবার ইন্টারনেটে ইদানীং অনেক বিষয়বস্তু ভিডিও আকারে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কোনো একটি বিষয় ব্যাখ্যা করেন, সেটি ক্যামেরায় ধারণ করা হয় এবং তারপর সেটি ইউটিউবে (www.youtube.com)–এর মতো কোনো ভিডিও শেয়ারিং সাইটে আপলোড করা হয়। সেখান থেকে এই ভিডিওটি সবাই দেখতে পারে। আবার অনেক সাইটে রয়েছে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন এনিমেশন বা কার্টুন চিত্র। এখানে পাঠ্যসূচির বিভিন্ন বিষয় কার্টুন বা এনিমেশনের মাধ্যমে বোঝানো হয়ে থাকে। ইন্টারনেটের এ সকল সাইটের কোনো কোনোটিতে রয়েছে প্রশ্ন করার সুযোগ, কোনোটিতে আছে কুইজের ব্যবস্থা। আবার অনেক সাইটে রয়েছে পরীক্ষারও ব্যবস্থা।

বর্তমানে ইন্টারনেটে অনেক কোর্সও চালু হয়েছে। এ সকল সাইটে কোনো সুনির্দিষ্ট কোর্সে নিবন্ধন করে ক্লাস করা যায় এবং কোর্স শেষে পরীক্ষা দেওয়া যায়। ইংরেজি ভাষাতে চালু এরকম অনেক সাইট রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হলো- www.coursera.org, www.edx.org, alison.com ইত্যাদি। বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) তাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কোর্স অফার করে থাকে। ocw.mit.edu এই সাইটে গিয়ে পৃথিবীর যেকোনো দেশ থেকে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করে সম্পন্ন করা যায়।

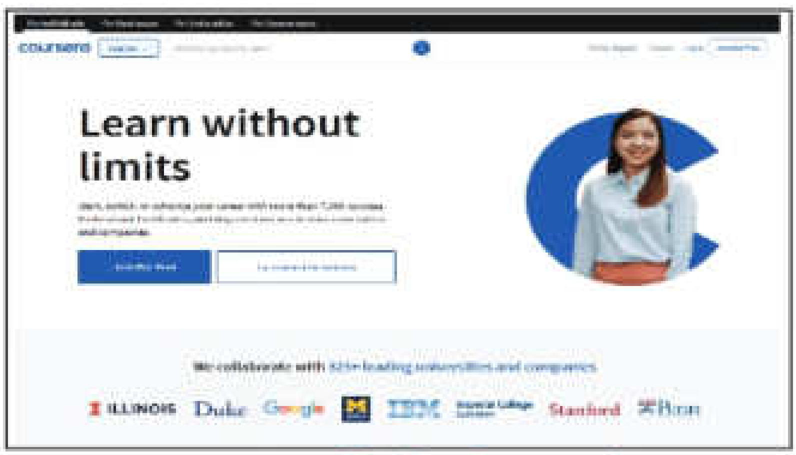

www.coursera.org- তে বিভিন্ন বিষয়ে বিনামূল্যে কোর্স করা যায়

২০২৫

কেবল ইংরেজিতে নয়, বাংলা ভাষাতেও এখন ইন্টারনেটে শিক্ষা কার্যক্রম বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে স্কুল পর্যায়ের সব পাঠ্যপুস্তক এখন ই-বুক আকারে পাওয়া যায়। www.nctb.gov.bd সাইট থেকে তুমি তোমার বই-এর ই-বুক সংস্করণ নামিয়ে নিতে পারো।

বাংলা ভাষাতেও এখন শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স চালু হয়েছে। এরকম একটি সাইট হলো http://shikkhok.com এখানে গণিত, পরিবেশবিজ্ঞান, কম্পিউটার কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন কোর্স করার সুযোগ আছে।

অন্যান্য যেকোনো বিষয়ের মতো ইন্টারনেটে শিক্ষা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য জানার সহজ উপায় হলো কোনো একটি সার্চ ইঞ্জিনে এ সম্পর্কিত তথ্য খোঁজ করা। তথ্য খোঁজার জন্য সঠিকভাবে অনুসন্ধানটি লিখতে হয়।

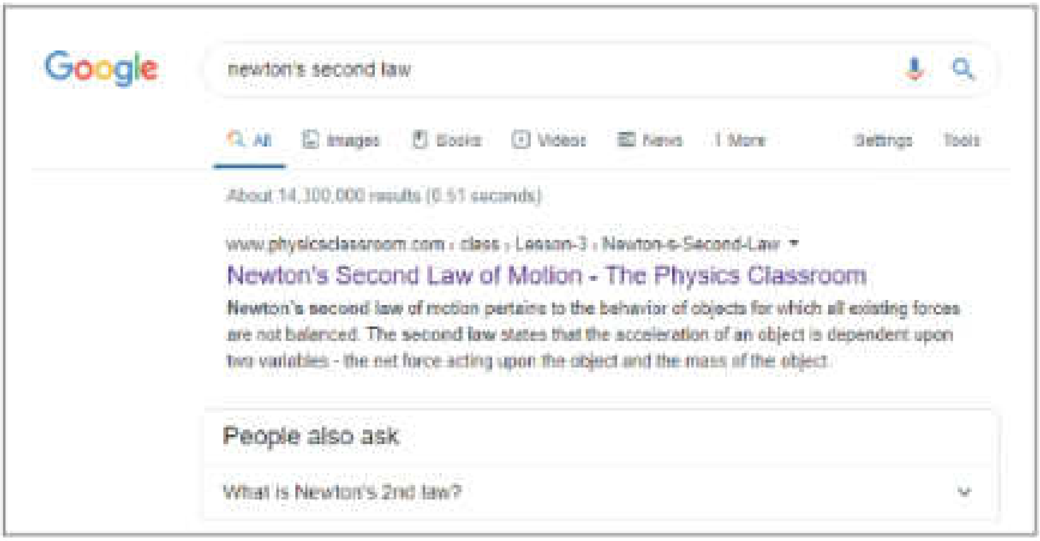

এখানে সার্চ ইঞ্জিন গুগলে নিউটনের গতি সূত্র সংক্রান্ত তথ্য খোঁজার একটি উদাহরণ দেখানো হলো। দেখা যাচ্ছে প্রায় ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ওয়েবসাইট বা ভিডিওতে এ সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। সেখান থেকে তুমি তথ্য বেছে নিতে পারো।

সব সার্চ ইঞ্জিনেই সঠিকভাবে লিখতে পারলে যেকোনো তথ্য সম্পর্কে অসংখ্য তথ্যের লিংক পাওয়া যায়। এজন্য ইন্টারনেট থেকে তথ্য বের করার কাজে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহারে দক্ষ হতে হয়। এই দক্ষতা অর্জন সহজ হয় যদি তুমি নিয়মিত তা ব্যবহার করো।

ইন্টারনেটে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্যের লিংকে সঠিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের করা যায়। সার্চ ইঞ্জিনে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে তথ্য অনুসন্ধান করা যায়।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অজস্র শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য। সেখানে থেকে বাছাই করা কয়েকটি সাইটের বর্ণনা এখানে দেওয়া হলো।

১। www.nctb.gov.bd: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড -এর ওয়েবসাইটে রয়েছে তোমাদের বিভিন্ন শ্রেণির সকল পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক সংস্করণ। ই-বুক হলো মুদ্রিত বইয়ের ডিজিটাল সংস্করণ। এই বইগুলো কম্পিউটারের পর্দায় পড়া যায়, পাতা উল্টানো যায়, যেকোনো পাতায় চলে যাওয়া যায়। এই সাইটে গিয়ে তুমি তোমার ক্লাসের যেকোনো বই খুঁজে বের করতে পারবে। শুধু তোমার ক্লাসের নয়, তোমার ছোট ভাইবোনের বা তোমার আপু-ভাইয়াদের বইও তুমি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে তোমার কম্পিউটারে বা স্মার্টফোনে।

দলগত কাজ

এবার গুগুল বা ইয়াহু বা তোমার প্রিয় কোন সার্চ ইঞ্জিনে নিচের শব্দাবলী দিয়ে সার্চ করে সেটির ফলাফলগুলো দেখ:

১. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা
২. Origin of Matter
৩. William Shakespeare
৪. কাজী নজরুল ইসলাম
৫. পদার্থের তিন অবস্থা

২। www.moedu.gov.bd: এটি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট। এতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত সকল নীতিনির্ধারণী বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। শিক্ষানীতি, সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা শুরু বা এর ফলাফল ঘোষণার তারিখ ইত্যাদি এই সাইট থেকে জানা যায়।

৩। উইকিপিডিয়া (www.wikipedia.org): ইন্টারনেটের সবচেয়ে বড় মুক্ত বিশ্বকোষ হলো উইকিপিডিয়া। এটি সারা বিশ্বের মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তৈরি করেছেন এবং ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে চলেছেন। প্রায় দুইশরও বেশি ভাষায় এটি চালু রয়েছে তবে আমাদের জন্য এর ইংরেজি ও বাংলা বিশ্বকোষটি খুবই দরকারি। ইংরেজি ভাষার উইকিপিডিয়াতে প্রায় ৭০ লক্ষ নিবন্ধ রয়েছে যার অনেকগুলো সরাসরি শিক্ষা সক্রান্ত। প্রত্যেক উইকিপিডিয়াতে অনুসন্ধান করার একটি বাক্স রয়েছে। সেখানে তোমার কাঙ্ক্ষিত শব্দ বা শব্দাবলি লিখলে তুমি এই সংক্রান্ত নিবন্ধ বা নিবন্ধাবলি দেখতে পাবে। বাংলা ভাষায় উইকিপিডিয়া এখনো ততটা সমৃদ্ধ নয়। এতে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশি নিবন্ধ আছে এবং সেখান থেকে তোমার কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতেও পার।

৪। বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় একটি শিক্ষা সাইট হলো **www.khanacademy.org** ।

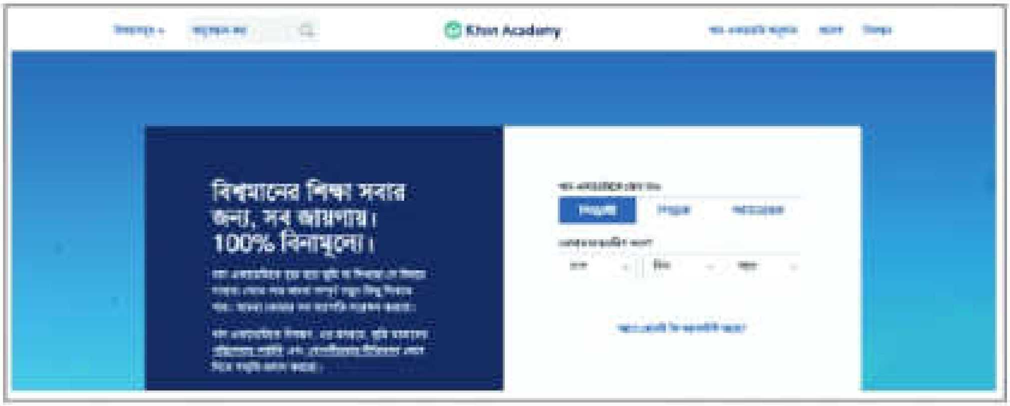

বাংলা ভাষায় খান একাডেমির ভিডিও থেকে পছন্দমতো ভিডিও বাছাই করে ডাউনলোড করা যায়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষাবিদ সালমান খান ২০০৬ সালে খান একাডেমি সাইটটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাইটে তিনি প্রায় ১০ হাজার ছোট ছোট ভিডিওর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে গণিত, ইতিহাস, স্বাস্থ্যসেবা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, অর্থনীতি, মহাকাশ বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রভৃতি। এই ছোট ভিডিওগুলোতে সালমান খান তার নিজের মতো করে বিষয়গুলোকে সহজভাবে তুলে ধরেছেন। তার ভিডিওগুলো এরই মধ্যে ২১৩ কোটিরও বেশিবার দেখা হয়েছে। এখান থেকে তুমি তোমার দরকারি ভিডিওটি ডাউনলোড করে নিতে পার।

৫। বাংলা ভাষায় খান একাডেমি **(bn. khanacademy.org):** খান একাডেমির সব ভিডিও ইংরেজি ভাষাতে। তবে, আনন্দের বিষয় হলো এই ভিডিওগুলো বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতে অনূদিত হয়েছে যার মধ্যে বাংলা ভাষাও রয়েছে। বিজ্ঞানের পাঠগুলোর বাংলা অনুবাদ তুমি এই ঠিকানায় পাবে - এখানকার ভিডিওগুলো জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং জৈবরসায়ন এই চারভাগে ভাগ করা আছে। প্রত্যেক লিংকের শুরুতে তালিকা রয়েছে যা থেকে পছন্দমতো ভিডিও বাছাই করা যায়। আর গণিতের ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় www.youtube.com/user/KhanAcademyBangla এখানে অনেক ভিডিও রয়েছে। তুমি তোমার পছন্দ মতো বীজগণিত, পাটিগণিত, পরিসংখ্যান, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদির ভিডিও থেকে তোমার দরকারি ভিডিওটি ডাউনলোড করে শেখার কাজে লাগাতে পার।

৬। বিবিসি জানালা (https://bbcjanala.ghoorilearning.com): এটি একটি ইংরেজি ভাষা শেখার সাইট। ইন্টারনেটে ইংরেজি ভাষা শেখার অজস্র সাইট রয়েছে। তবে, এই সাইটটি আমাদের দেশের উপযোগী উদাহরণ এবং ব্যাখ্যার কারণে দেশে বেশি জনপ্রিয়। এই সাইটে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বেশকিছু চমৎকার কোর্স রয়েছে। ইন্টারনেটে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যে কেউ খুব সহজেই এই কোর্সগুলোতে অংশ নিতে পারে। কোর্স শেষে কোর্স রিপোর্ট বা কোর্স সমাপনী সার্টিফিকেট প্রিন্ট করে নেওয়া যায়। তোমার ইংরেজির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তুমি এই কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পার।

৭। **https://www.themathdoctors.org**: একটি জনপ্রিয় গণিত বিষয়ক সাইট। এই সাইটে স্কুল পর্যায়ের গণিতের বিভিন্ন বিষয় সহজ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথেষ্ট উদাহরণ এবং বিভিন্নভাবে বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যালকুলাসের নানান বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এই সাইটে কোনো বিষয় পাওয়া না গেলে তা জানার জন্য Dr Math কে প্রশ্ন করা যায়।

৮। **https://matholympiad.org.bd**: এটি একটি গণিতবিষয়ক প্রশ্নোত্তর, আলোচনার সাইট। বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এটি পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা নিয়ে এই ফোরামটিতে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এছাড়া এখানে বিভিন্ন সময় প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

৯। **https://www.learningscientists.org** ওয়েবসাইটে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

১০। **www.w3schools.com** অথবা **www.tutorialspoint.com** হলো বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা শেখার জনপ্রিয় ওয়েবসাইট।

১১। ঐতিহাসিক মৌলিক গ্রন্থ সমূহ: আজকের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের বিশাল অবদান। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং সমাজ সংস্কারকগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাদের সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের লিখিত বইয়ে। ইন্টারনেটে এরূপ মৌলিক গ্রন্থগুলোর ডিজিটাল সংস্করণ পাওয়া যায়। এরকম কয়েকটি গ্রন্থের লিংক নিচে দেওয়া হলো:

ইউক্লিডের এলিমেন্টস	**https://www.gutenberg.org/files/21076/21076-pdf.pdf**
নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা	**https://redlightrobber.com/red/links_pdf/Isaac-Newton-Principia-English-1846.pdf**
ডারউইনের দি অরিজিন অব স্পেসিস	**https://labgenmol-fo-unam.com/wp-content/uploads/2019/04/the-origin-of-species_charles-darwin.pdf**

এইরূপ প্রায় সকল বিখ্যাত গ্রন্থের ডিজিটাল সংস্করণ এখন ইন্টারনেট থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায়। সঠিকভাবে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে তুমি সেটা বের করে নিতে পারো।

নমুনা প্রশ্ন

১. কোন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট হতে বাংলাদেশের স্কুল ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড করা যায়?

ক. ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
খ. মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
গ. কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

২. ওয়েব সাইটে স্কুল ও মাদ্রাসার যে পাঠ্যপুস্তকগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকে কী বলে?

ক. ই-বুক
খ. ইন্টারনেট বুক
গ. এনসিটিবি বুক
ঘ. ডিজিটাল বুক

৩. ইন্টারনেটের সাহায্যে—

i. পাঠবিষয়ে সহায়তা পাওয়া যায়
ii. ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়
iii. অনলাইনে ক্লাস করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

গণিত ও ইংরেজিতে অনি প্রায়ই খারাপ ফলাফল করে। খেতে হয় মা-বাবার বকুনি। প্রথাগতভাবে গণিত শিখতে তার ভালো লাগে না। আনন্দের সাথে সে গণিত শিখতে চায়। অনির ইচ্ছা সে অন্যদের মতো গণিত শিখে গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিবে।

৪. অনি তার সমস্যা সমাধানে সাহায্য পেতে পারে—

i. ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে
ii. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে
iii. কম্পিউটার ব্যবহার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫. অনির জন্য গণিত শেখার সবচেয়ে সুবিধাজনক ওয়েবসাইট কোনটি?

ক. www.matholympiad.org.bd

খ. www.khanacademy.org

গ. www.themathdoctors.org

ঘ. www.bn.khanacademy.org

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম–তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সুস্থ দেহ সুন্দর মন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।